ফিকহ বিভাগ – ৩য় পত্র : উসূলুল ফিকহ ১ - ৬৩১১০৩

ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : اصول البزدوى - উসূলুল বাযদাভী

উসূলুল বাযদাভী সূচিপত্র

১- ما معنى الفقه لغة واصطلاحا؟ وكم قسما له؟ وعلى من يصلح اطلاق لفظ الفقيه؟ ومن هم السابقون في باب الفقه؟

প্রশ্ন-১: 'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কয়টি ভাগ রয়েছে? কার প্রতি 'ফকীহ' শব্দটি প্রয়োগ করা সমীচীন? ফিকহ শাস্ত্রের প্রথম দিকের (সাবেকীন) আলেমগণ কারা?

২- قال البزدوى العلم نوعان - فما المقصود بهذين النوعين؟ ثم بين اصل كل نوع منهما مع اقسام النوع الثاني بالتفصيل-

প্রশ্ন-২: ইমাম বাযদাবী বলেছেন, "জ্ঞান দুই প্রকার"। এই দুই প্রকার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তারপর প্রত্যেক প্রকারের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর এবং দ্বিতীয় প্রকারের ভাগগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৩- عرف علم اصول الفقه واذكر موضوعه وغرضه وواضعه ومنبعه وفائدته -

প্রশ্ন-৩: উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা দাও। এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রবর্তক, উৎস এবং উপকারিতা উল্লেখ কর।

او- ما المراد بعلم أصول الفقه؟ تحدث عن موضوعه وغرضه وواضعه ومنبعه وفائدته مفصلا-

অথবা, উসূলে ফিকহ শাস্ত্র বলতে কী বোঝায়? এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রবর্তক, উৎস এবং উপকারিতা বিস্তারিতভারে আলোচনা কর।

٤- ما معنى الاصول لغة وشرعا ؟ اصول الشرع كم هي وما هي؟ بين بالتفصيل -

প্রশ্ন-৪: উসুল শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শরীয়তের উসূল (মূলনীতি) কয়টি এবং সেগুলো কী কী? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

٥- ما معنى الأصل لغة وشرعا؟ وما هو المراد باصول الشرع وكم أصلا للشرع؟ بين وجه الضبط في الأربعة - ولم أفرد المصنف رحمه الله القياس ولم قال فيه : الأصل الرابع؟

প্রশ্ন-৫: উসূল শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উসুলে শরীয়া (শরীয়তের মূলনীতি) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এবং শরীয়তের আসল কয়টি? চারটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) কেন কিয়াসের বিষয়টিকে আলাদা করেছেন এবং কেন তিনি এটিকে 'চতুর্থ আসল' বলেছেন?

٦- عرف الكتاب موضحا مع بيان فوائد قيوده - ثم بين تفصيلا هل القران اسم للنظم والمعنى جميعا ام لا؟

প্রশ্ন-৬: 'কিতাব'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর শর্তগুলোর উপকারিতা স্পষ্ট করে উল্লেখ কর। তারপর বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর যে, কুরআন কি নযম (শব্দবিন্যাস) এবং মা'না (অর্থ) উভয়েরই নাম, নাকি নয়?

٧- ما المراد بنظم القرآن ومعناه؟ وما أقسامهما التي ذكرها الامام البزدوى (رح) ؟ بين موضحا–

প্রশ্ন-৭: কুরআনের নযম ও মা'না দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ইমাম বাযদাবী (র) এগুলোর যে ভাগ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কী কী? স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা কর।

٨- اشرح قول المصنف رحمه الله "القسم الاول في وجوه النظم صيغة ولغة" مع بيان تعريف - الاوجه الاربعة المذكورة تحت هذا العنوان بالامثلة -

প্রশ্ন-৮: গ্রন্থকার (র)-এর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর: "প্রথম প্রকার নযমের দিকসমূহ, যা কাঠামো ও ভাষার ভিত্তিতে হয়"। এই শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত চারটি দিকের সংজ্ঞা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

٩- عرف الخاص لغة وشرعا - ثم بين اقسامه بالتمثيل - ثم أوضح "ان اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة" بالتمثيل والتفصيل –

প্রশ্ন-৯: 'খাস' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। তারপর উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। এরপর উদাহরণ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট কর যে, "খাস শব্দ সন্দেহাতীতভাবে ও নিশ্চিতরূপে 'মাখসূস'কে (নির্দিষ্ট বিষয়) অন্তর্ভুক্ত করে"।

١٠- عرف الخاص مع بيان أقسامه بالتفصيل والتمثيل - ثم أوضح حكمه –

প্রশ্ন-১০: 'খাস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর। তারপর এর বিধান স্পষ্ট কর।

١١- عرف العام مع بيان فوائد قيوده واقسامه - ثم بين ماذا تعرف عن تخصيص العام بالتفصيل والتمثيل –

প্রশ্ন-১১: আম- এর সংজ্ঞা দাও এবং এর শর্তগুলোর উপকারিতা ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। তারপর 'আম' কে 'তাখসীস' (নির্দিষ্টকরণ) করার বিষয়ে তুমি যা জান, তা বিস্তারিত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

١٢- هل يقتضي الامر بالشيء نهيا عن ضده؟ وهل يدل النهي على فساد المنهى عنه؟ وما أراء العلماء فيه؟ بين بالادلة –

প্রশ্ন-১২: কোনো কিছু আদেশ করা কি তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়? নিষেধ কি নিষিদ্ধ কাজটিকে ফাসেদ (অবৈধ/বাতিল) হওয়া প্রমাণ করে? এ বিষয়ে আলেমদের মতামত কী? দলিলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

١٣- عرف النهى لغة وشرعا ثم بين أنواع النهي مع الحكم مفصلا وممثلا –

প্রশ্ন-১৩: 'নাহী' (নিষেধ) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। তারপর নাহীর প্রকারভেদ ও বিধান বিস্তারিত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।]

١٤- عرف الامر - ثم بين انواعه وحكمه / موجبه وصيغه بالتفصيل –

প্রশ্ন-১৪: 'আমর'-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর এর প্রকারভেদ, বিধান এবং রূপগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

١٥- ما هو النسخ؟ بين اختلاف الأئمة في نسخ الكتاب بالسنة –

প্রশ্ন-১৫: 'নাসখ কী? সুন্নাহ (হাদীস) দ্বারা কিতাব (কুরআন) নাসখ হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য ব্যাখ্যা কর।]

١٦- عرف الظاهر والنص - ثم بين أحكامهما مع ايراد الامثلة –

প্রশ্ন-১৬: 'যাহের' এবং 'নস'- এর সংজ্ঞা দাও। তারপর উদাহরণসহ তাদের বিধান ব্যাখ্যা কর।

١٧- عرف الاداء والقضاء - هل يجب القضاء بما يجب به الاداء؟ وما الاختلاف فيه بين الائمة؟ بين –

প্রশ্ন-১৭: 'আদা' ও 'কাযা'- এর সংজ্ঞা দাও। যে কারণে 'আদা' ওয়াজিব হয়, সে কারণে কি 'কাযা'ও ওয়াজিব হয়? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, তা ব্যাখ্যা কর।

١٨- عرف الاداء والقضاء مع ذكر انواعهما مفصلا وممثلا–

প্রশ্ন-১৮: 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং তাদের প্রকারভেদ গুলো বিস্তারিত উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

١٩- عرف الامر والنهي - ثم بين صيغ الأمر والنهي مع ذكر موجبهما والاختلاف فيه بالادلة .

প্রশ্ন-১৯: 'আমর' ও 'নাহী'-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর আমর ও নাহীর রূপগুলো উল্লেখ কর এবং তাদের মোজিব (যা ওয়াজিব করে) কী এবং এ বিষয়ে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা দলিলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা কর।

٢٠- عرف البيان واذكر أقسامه - ثم اكتب ما تعرف عن تأخير البيان عن وقت الحاجة –

প্রশ্ন-২০: 'বায়ান'- এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। তারপর প্রয়োজনের সময় থেকে 'বায়ান'কে বিলম্বিত করা সম্পর্কে তুমি যা জান, তা লেখো।

٢١- ما معنى العام لغة واصطلاحا؟ وما حكمه؟ هل يبقى حجة اذا لحقه خصوص؟ اذكر اختلاف العلماء فيه –

প্রশ্ন-২১: 'আম' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিধান কী? যদি তাতে 'খুসূস' (নির্দিষ্টকরণ) আসে, তবে কি তা হুজ্জত (দলিল) হিসেবে বাকি থাকে? এ বিষয়ে আলেমদের মতপার্থক্য উল্লেখ কর।

٢٢- عرف الدلالات - ثم اكتب أقسام الدلالات بالتفصيل –

প্রশ্ন-২২: 'দালালত' (নির্দেশনাসমূহ)-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর দালালতের প্রকারগুলো বিস্তারিতভাবে লেখ।

٢٣- ما معنى العام لغة واصطلاحا؟ وكم نوعا له ؟ ثم بين الفاخذ العموم مفصلا –

প্রশ্ন-২৩: 'আম' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কয়টি প্রকার রয়েছে? তারপর 'উমুমের শব্দগুলো' (আলফাজুল উমুম) বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।]

٢٤- الفاظ العموم كم هي وما هي؟ ثم بين احكام العموم مختصرا –

প্রশ্ন-২৪: উমুমের শব্দগুলো কয়টি এবং কী কী? তারপর সংক্ষেপে উমুমের বিধানগুলো ব্যাখ্যা কর।

٢٥- بين حكم الحقيقة والمجاز وهل يراد الحقيقة والمجاز بلفظ واحد؟ فصل المسائل بالادلة –

প্রশ্ন-২৫: 'হাক্বীকৃত' ও 'মাজায'- এর বিধান ব্যাখ্যা কর। একটি মাত্র শব্দ দ্বারা কি 'হাক্বীকৃত' ও 'মাজায' উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে? দলিলের মাধ্যমে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ কর।

٢٦- ما الحقيقة والمجاز؟ اذكر الحالات التي تترك فيها الحقيقة بالتفصيل –

প্রশ্ন-২৬: 'হাক্বীকৃত' ও 'মাজায' কী? যে সমস্ত ক্ষেত্রে 'হাক্বীকৃত' (আভিধানিক অর্থ) পরিত্যাগ করা হয়, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দাও।

٢٧- ما معنى المشترك والمؤول لغة واصطلاحا ؟ بين بالامثلة –

প্রশ্ন-২৭: مؤول ও مشترك এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

٢٨- ما المراد بحروف المعاني؟ ثم اذكر معنى الواو والفاء وثم وحتى –

প্রশ্ন-২৮: 'হরুফ-আল মাআনী' (অর্থবোধক অব্যয়) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তারপর ওয়াও, ফা, ছুম্মা ও হাত্তা- এর অর্থ উল্লেখ কর।

٢٩- عرف المصطلحات الأتية مع الامثلة : المحكم - المتشابه - اشارة النص - المفسر - المجمل - اقتضاء النص – الخفي –

প্রশ্ন-২৯: নিচের পরিভাষাগুলোর উর্দাহরণসহ সংজ্ঞা দাও: মুহকাম, মুতাশাবিহ, ইশারাতুন-নস, মুফাসসার, মুজমাল, ইকুতিদাউন-নস, খাফী।

٣٠- ما معنى السنة لغة وشرعا؟ كم قسما لها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ هل كان له حظ في الاجتهاد والرأى؟ بين –

প্রশ্ন-৩০: 'সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? নবী (স)-এর ক্ষেত্রে এর কয়টি ভাগ রয়েছে? ইজতিহাদ ও রায়ের (পরামর্শ) ক্ষেত্রে কি তাঁর কোনো অংশ ছিল? ব্যাখ্যা কর।

٣١- ما معنى الخبر لغة وشرعا ؟ وكم قسما له بحيث الاتصال؟

ফিকহ বিভাগ – ৩য় পত্র : উসূলুল ফিকহ ১ - ৬৩১১০৩

প্রশ্ন-৩১: খবর- এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সংযুক্তির ভিত্তিতে এর কয়টি প্রকার রয়েছে?

٣٢- عرف المصطلحات الآتية مع الامثلة : الخفى، والمشكل والمشترك والمؤول، والدلالة بعبارة النص، والدلالة بإشارة النص –

প্রশ্ন-৩২: নিচের পরিভাষাগুলোর উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও: খাফী, মুশকিল, মুশতারাক, মুআউয়াল, عبارة النص দ্বারা নির্দেশনা এবং إشارة النص দ্বারা দির্দেশনা।

٣٣- خبر الواحد يوجب العمل لا العلم اليقيني "اذكر معنى هذا الكلام - ثم اذكر أدلة حجية خبر الواحد في الامور العملية من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول–

প্রশ্ন-৩৩: খবরে ওয়াহেদ (একক বর্ণনাকারীর হাদীস) ইলম-এ ইয়াক্বীনী (সুনিশ্চিত জ্ঞান) ওয়াজিব করে না, তবে আমল (অনুসরণ) ওয়াজিব করে।" এ কথাটির অর্থ উল্লেখ কর। তারপর আমলী (কার্যকর) বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদের হুজ্জত (প্রমাণিকতা) সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও যুক্তি (মা'কূল) থেকে দলিলসমূহ উল্লেখ কর।

٣٤- ما الرخصة؟ بين أقسامها بالتفصيل والتمثيل –

প্রশ্ন-৩৪: 'রুখসা' কী? উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

٣٥- ما معنى المعارضة؟ تحدث عن شرطها وركنها وحكمها –

প্রশ্ন-৩৫: মুআরাদা' (বিরোধ)-এর অর্থ কী? এর শর্ত, রুকন ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা কর।

٣٦- ما معنى المعارضة لغة وشرعا ؟ ثم بين اقسام المعارضة مع حكمها بالتفصيل –

প্রশ্ন-৩৬: 'মুআরাদা' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তারপর মুআরাদার প্রকারভেদ এবং তাদের বিধান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

٣٧- ما معنى السنة لغة وشرعا ؟ كم قسما لها حسب مراتب أصول الفقه؟

প্রশ্ন-৩৭: 'সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উসূলেফিকহের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী এর কয়টি ভাগ রয়েছে?

٣٨- ما معنى محل الخبر؟ تحدث عن أنواعه والاحتجاج فيها بأخبار الأحاد –

প্রশ্ন-৩৮: 'মাহালুল খবর' এর স্থান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এর প্রকারভেদ এবং সেগুলোতে আহাদ (একক) হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা সম্পর্কে আলোচনা কর।

٣٩- ما هي الصفات التي تعتبر في الرواة؟ ولم لا يجعل خبر الفاسق حجة؟ بين مفصلا –

প্রশ্ন-৩৯: রাবীদের (বর্ণনাকারী) ক্ষেত্রে কোন গুণাবলি বিবেচনা করা হয়? কেন ফাসেক (পাপী)-এর খবরকে হুজ্জত (দলিল) হিসেবে গণ্য করা হয় না? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

٤٠- ما هو البيان؟ وكم قسما له؟ عرف كل قسم منه مع بيان نظائره –

প্রশ্ন-৪০: 'বায়ান' কী? এর কয়টি ভাগ রয়েছে? প্রত্যেক ভাগের সংজ্ঞা দাও এবং তাদের অনুরূপ বিষয়গুলো (নযায়ের) ব্যাখ্যা কর।

٤١- عرف العزيمة والرخصة - ثم اذكر أقسامهما مفصلا –

প্রশ্ন-৪১: আযীমা' ও 'রুখসা'- এর সংজ্ঞা দাও। তারপর তাদের প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।

١ -ما معنى الفقه لغة واصطلاحا؟ وكم قسما له؟ وعلى من يصلح اطلاق لفظ الفقيه؟ ومن هم السابقون في باب الفقه؟

[প্রশ্ন-১: 'ফিকহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কয়টি ভাগ রয়েছে? কার প্রতি 'ফকীহ' শব্দটি প্রয়োগ করা সমীচীন? ফিকহ শাস্ত্রের প্রথম দিকের (সাবেকীন) আলেমগণ কারা?]

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলী সঠিকভাবে পালন করার জন্য 'ফিকহ' বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহর গভীর ও সূক্ষ্ম নির্যাস হলো ফিকহ। মহান আল্লাহ তায়ালা যাঁদের কল্যাণ চান, তাঁদেরকে দ্বীনের ফিকহ বা গভীর বুঝ দান করেন। ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি, সংজ্ঞা এবং এর ধারক-বাহকদের পরিচয় জানা একজন তালেবে ইলমের জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিম্নে প্রশ্নের আলোকে ফিকহ শাস্ত্রের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১. ফিকহ শব্দের আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِلْفِقْهِ):

'ফিকহ' (الْفِقْهُ) একটি আরবি শব্দ। আভিধানিক বা শব্দগতভাবে এর অর্থ হলো:

- **আল-ফাহমু (الْفَهْمُ):** অর্থাৎ বুঝা বা অনুধাবন করা।
- আল-ফাতিনাতু (الْفَطِنَةُ): অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা বা বিচক্ষণতা।

কোনো বক্তার কথার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ গভীরভাবে অনুধাবন করাকে অভিধানে ফিকহ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

"قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ"

(তারা বলল, হে শুআইব! আপনি যা বলেন তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না।)

২. ফিকহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ (الْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيُّ):

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফিকহের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জামে (পূর্ণাঙ্গ) সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)। তিনি বলেন:

"الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا"

(ফিকহ হলো নফসের বা আত্মার জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো জানা।)

ব্যাখ্যা: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা তিনি আকিদা (বিশ্বাস), আমল (কর্ম) এবং আখলাক (চরিত্র)—এই তিন শাখার জ্ঞানকেই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ যা কিছু মানুষের পরকালীন মুক্তির জন্য 'পক্ষে' (মা লাহা) এবং যা কিছু 'বিপক্ষে' (মা আলাইহা) যাবে, তা জানাই হলো ফিকহ।

পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (মুতাআখখিরীন) এই সংজ্ঞার সাথে **"আমালান"** (عَمَلًا) শব্দটি যুক্ত করেছেন যাতে আকিদা বা বিশ্বাসগত বিষয়গুলো 'ইলমুল কালাম'-এর দিকে চলে যায় এবং ফিকহ কেবল ব্যবহারিক বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের মতে:

"ফিকহ হলো শরিয়তের সেই সব ব্যবহারিক বিধি-বিধান জানা, যা বিস্তারিত দলিল থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে আহরণ করা হয়।"

৩. ফিকহের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْفِقْهِ):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সংজ্ঞার আলোকে ফিকহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- **(ক) আল-ফিকহুল আকবার (الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ):** এটি হলো আকিদা বা বিশ্বাস সংক্রান্ত জ্ঞান। যেমন—আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আকিদা বিষয়ক তাঁর কিতাবের নাম রেখেছিলেন 'আল-ফিকহুল আকবার'।

- **(খ) আল-ফিকহুল আসগার বা ফিকহুল আহকাম (الْفِقْهُ الْأَصْغَرُ):** এটি হলো ইবাদত ও মুআমালাত (লেনদেন) সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞান। সাধারণত মাদরাসায় ফিকহ বলতে এই অংশটিকেই বোঝানো হয়।

৪. ফকীহ শব্দের যথাযথ প্রয়োগ (إِطْلَاقُ لَفْظِ الْفَقِيهِ):

কার ওপর 'ফকীহ' শব্দটি প্রয়োগ করা সঠিক বা সমীচীন, এ বিষয়ে উসুলবিদগণ সুনির্দিষ্ট মত দিয়েছেন। শুধুমাত্র মাসআলা মুখস্থকারীকে ফকীহ বলা যায় না।

- **প্রকৃত ফকীহ:** ফকীহ তিনিই, যার মধ্যে শরিয়তের দলিল (কুরআন, সুন্নাহ) থেকে বিধান বের করার বা 'ইস্তিমবাত' করার যোগ্যতা (মালাকাহ) রয়েছে। যিনি নস বা মূলপাঠের গোপন রহস্য, ইঙ্গিত এবং হুকুমের কারণ (ইল্লত) অনুধাবন করতে সক্ষম।

- **হাদিস বর্ণনাকারী বনাম ফকীহ:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যারা কেবল হাদিস বর্ণনা করেন কিন্তু এর মর্মার্থ বোঝেন না, তারা ফকীহ নন। ফকীহ হলেন তিনি, যিনি বর্ণনার পাশাপাশি দিরায়াত বা প্রজ্ঞার অধিকারী।

৫. ফিকহ শাস্ত্রের সাবেকীন বা পূর্ববর্তীগণ (السَّابِقُونَ فِي بَابِ الْفِقْهِ):

ইসলামের ইতিহাসে যারা ফিকহ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে এর প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন, তাঁরাই হলেন 'সাবেকীন' বা অগ্রবর্তী ফকিহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

- **(ক) সাহাবায়ে কেরাম (র.):** সাহাবীদের মধ্যে যারা ফতোয়া দিতেন, তাঁরা ছিলেন প্রথম সারির ফকীহ। যেমন—চার খলিফা (হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ও হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)।

- **(খ) তাবেয়ীগণ (র.):** সাহাবীদের পর তাবেয়ীদের এক বিশাল জামাত ফিকহ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। যেমন—কুফার ফকিহ ইব্রাহিম আন-নাখায়ী, মদিনার সাত ফকিহ (সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব প্রমুখ), হাসান বসরি (রহ.)।

- **(গ) মুজতাহিদ ইমামগণ:** এরপর আসেন ফিকহী মাজহাবের সংকলকগণ। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর যোগ্য শিষ্যগণ (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) হলেন ফিকহ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী সাবেকীন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ফিকহ হলো দ্বীনের সঠিক বুঝ। মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য ফিকহের জ্ঞান অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে মুজতাহিদ ইমামগণ পর্যন্ত সকলেই ছিলেন এই শাস্ত্রের পথিকৃৎ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আজ আমরা শরিয়তের বিধানগুলো সুবিন্যস্ত আকারে পেয়েছি।

প্রশ্ন-২: ইমাম বাযদাবী বলেছেন, "জ্ঞান দুই প্রকার"। এই দুই প্রকার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? তারপর প্রত্যেক প্রকারের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর এবং দ্বিতীয় প্রকারের ভাগগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

(قال البزدوى العلم نوعان - فما المقصود بهذين النوعين؟ ثم بين اصل كل نوع منهما مع اقسام النوع الثاني بالتفصيل)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি উসুল শাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম, 'ফখরুল ইসলাম' আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'উসুলুল বাজদাবি'-এর সূচনা করেছেন ইলম বা জ্ঞানের প্রকারভেদ বর্ণনার মাধ্যমে। দ্বীনের জ্ঞানার্জন এবং তার ওপর আমল করার সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তিনি ইলমকে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর এই বিভাজন নিছক তাত্ত্বিক নয়, বরং এটি একজন মুমিনের আকিদা ও আমলের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। নিম্নে ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর বর্ণিত জ্ঞানের দুই প্রকার, তাদের মূলনীতি এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. জ্ঞানের দুই প্রকার (نَوْعَا الْعِلْمِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) বলেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে ইলম বা জ্ঞান মূলত দুই প্রকার:

- (ক) ইলমুস তাওহিদ ওয়াস সিফাত (عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ):

এটি হলো মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও গুণাবলীর জ্ঞান। পরিভাষায় একে 'ইলমুল কালাম' বা 'ইলমুল আকাইদ' বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একে 'আল-ফিকহুল আকবার' বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলে অভিহিত করেছেন। এটি মানুষের বিশ্বাস বা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত।

- (খ) ইলমুশ শারায়ে' ওয়াল আহকাম (عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ):

এটি হলো শরিয়তের বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞান। পরিভাষায় একে 'ইলমুল ফিকহ' বা ব্যবহারিক আইনশাস্ত্র বলা হয়। এটি মানুষের আমল বা কর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

২. উভয় প্রকারের মূলনীতি বা উৎস (أَصْلُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُمَا):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) উভয় প্রকার জ্ঞানের ভিত্তি বা 'আসল' বর্ণনা করেছেন:

- **প্রথম প্রকারের (তাওহিদ) মূলনীতি:** এই জ্ঞানের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং প্রবৃত্তি (হযা) ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ, আকিদার ক্ষেত্রে মনগড়া যুক্তি বা দর্শন নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর পথ অনুসরণ করাই হলো এর মূলনীতি।

- দ্বিতীয় প্রকারের (ফিকহ) মূলনীতি: ফিকহ বা বিধানগত জ্ঞানের মূল ভিত্তি তিনটি—

১. কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কিতাব/কুরআন),

২. সুন্নাহ (রাসূল সা.-এর হাদিস), এবং

৩. ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য)।

চতুর্থ আরেকটি দলিল হলো কিয়াস (যৌক্তিক সাদৃশ্য), যা মূলত ওপরের তিনটি দলিল থেকেই উৎসারিত বা নির্গত হয় (মুসতাম্বাত)।

৩. দ্বিতীয় প্রকারের (ফিকহ/শরিয়ত) বিস্তারিত ভাগ (أَقْسَامُ النَّوْعِ الثَّانِي):

প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ 'ইলমুল ফিকহ' বা শরিয়তের জ্ঞানের ভাগগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। ইমাম বাজদাবি (রহ.) শরিয়তের জ্ঞান আহরণের জন্য এর দলিলগুলোকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) আল-কিতাব বা কুরআন (الْكِتَابُ):

এটি শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। ইমাম বাজদাবি (রহ.) কুরআনের আলোচনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একে অর্থের দিক থেকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন:

  - **শব্দের গঠনগত দিক:** যেমন—খাস (নির্দিষ্ট), আম (ব্যাপক), মুশতরাক (যৌথ) ইত্যাদি।
  - **ব্যবহারিক দিক:** যেমন—হাকিকত (প্রকৃত), মাজাজ (রূপক), সরিহ (স্পষ্ট), কিনায়া (অস্পষ্ট)।
  - **অর্থের প্রকাশ ও অস্পষ্টতা:** যেমন—জহির, নস, মুফাসসার, মুহকাম (স্পষ্ট অর্থে); এবং খফি, মুশকিল, মুজমাল, মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট অর্থে)।

- (খ) আস-সুন্নাহ বা হাদিস (السُّنَّةُ):

এটি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে সুন্নাহর অবস্থান। ইমাম বাজদাবি (রহ.) সুন্নাহকে বর্ণনার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

- **মুতাওয়াতির:** যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।
- **মাশহুর:** যা মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি পর্যায়ের প্রসিদ্ধ।
- **খবরে ওয়াহিদ:** যা একক বর্ণনাকারী সূত্রে প্রাপ্ত।

- (গ) আল-ইজমা বা ঐকমত্য (الْإِجْمَاعُ):

এটি তৃতীয় উৎস। কোনো যুগে উম্মতের মুজতাহিদগণ যদি কোনো বিষয়ে একমত হন, তবে তা অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়। ইমাম বাজদাবি (রহ.) সাহাবীদের ইজমাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।

- (ঘ) আল-কিয়াস (الْقِيَاسُ):

এটি চতুর্থ উৎস, যা মূলত পূর্ববর্তী তিনটি উৎসের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো নতুন সমস্যার সরাসরি সমাধান কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা-তে পাওয়া যায় না, তখন পূর্বের কোনো সদৃশ ঘটনার ইল্লত বা কারণের সাথে মিল রেখে যে সমাধান বের করা হয়, তাকে কিয়াস বলে। ইমাম বাজদাবি (রহ.) কিয়াসকে 'আসল' বা মূল দলিলের মর্যাদায় রাখেননি, বরং একে 'ফারা' বা শাখা দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন, যা মূল দলিল থেকে অর্থ বের করতে সাহায্য করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) জ্ঞানের এই শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে মুমিন জীবনের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রকারের মাধ্যমে তিনি মুমিনের 'ঈমান' এবং দ্বিতীয় প্রকারের মাধ্যমে 'আমল' বিশুদ্ধ করার পথ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রকারের (ফিকহ) ভাগগুলো—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস—হলো ইসলামি শরিয়তের চারটি খুঁটি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র দ্বীন। একজন ফকিহ বা মুজতাহিদের জন্য এই চারটি শাখার গভীর জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৩: উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা দাও। এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রবর্তক, উৎস এবং উপকারিতা উল্লেখ কর।

(عرف علم اصول الفقه واذكر موضوعه وغرضه وواضعه ومنبعه وفائدته)

অথবা, উসূলে ফিকহ শাস্ত্র বলতে কী বোঝায়? এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রবর্তক, উৎস এবং উপকারিতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

(او- ما المراد بعلم أصول الفقه؟ تحدث عن موضوعه وغرضه وواضعه ومنبعه وفائدته مفصلا)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিশাল অট্টালিকা যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা হলো 'উসূলুল ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি। কুরআন ও সুন্নাহর অতল সাগর থেকে মণি-মুক্তার মতো মাসআলা বা বিধান আহরণ করার জন্য এই শাস্ত্রটি একটি শক্তিশালী যন্ত্র বা হাতিয়ারের মতো। একজন মুজতাহিদের জন্য যেমন এই জ্ঞান অপরিহার্য, তেমনি শরিয়তের বিধানের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রবর্তকের পরিচয় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. উসূলে ফিকহ-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ):

'উসূলুল ফিকহ' (أُصُولُ الْفِقْهِ) একটি যৌগিক শব্দ। এটি দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত: 'উসূল' এবং 'ফিকহ'।

- **আভিধানিক বিশ্লেষণ:** 'উসূল' শব্দটি 'আসলের' (أَصْلٌ) বহুবচন। এর অর্থ হলো মূল, ভিত্তি বা যার ওপর অন্য বস্তু দণ্ডায়মান হয়। আর 'ফিকহ' (فِقْهٌ) শব্দের অর্থ হলো গভীর বুঝ বা অনুধাবন।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় উসূলুল ফিকহ বলা হয়:

" هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ."

(এমন সব নীতিমালার জ্ঞান, যার মাধ্যমে শরিয়তের বিস্তারিত দলিল [কুরআন-সুন্নাহ] থেকে ফিকহী বা ব্যবহারিক বিধানাবলি [যেমন—নামাজ ফরজ, সুদ হারাম] বের করা যায়।)

সহজ কথায়, যে নিয়মনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদগণ কুরআন-হাদিস থেকে মাসআলা বের করেন, সেই নিয়মনীতিকে উসূলুল ফিকহ বলে।

২. আলোচ্য বিষয় (مَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ):
প্রতিটি ইলম বা শাস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে। উসূলুল ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয় হলো 'শরিয়তের দলিলসমূহ' (الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ)। অর্থাৎ:

- কিতাবুল্লাহ (কুরআন)
- সুন্নাহ (হাদিস)
- ইজমা (ঐকমত্য)
- কিয়াস (যৌক্তিক সাদৃশ্য)

এই দলিলগুলো কীভাবে হুকুম বা বিধান প্রমাণ করে, এদের মধ্যে কোনটি প্রবল, কোনটি দুর্বল এবং পরস্পর বিরোধ হলে কীভাবে সমাধান করতে হয়—এগুলোই হলো এই শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (غَرَضُهُ وَغَايَتُهُ):
উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রটি নিছক তাত্ত্বিক কোনো বিষয় নয়, এর পেছনে মহান কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে:

- **ইস্তিমবাত বা বিধান আহরণ:** এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের দলিল থেকে সঠিক বিধান বের করার যোগ্যতা অর্জন করা।
- **সঠিক জ্ঞান লাভ:** কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, কোনটি ফরজ আর কোনটি ওয়াজিব—তা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে জানা।
- **উভয় জাহানের মুক্তি:** শরিয়তের সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি (ফাউজ) লাভ করা। ইমাম বাযদাবি (রহ.) বলেন, **"ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল করা, আর আমলের উদ্দেশ্য হলো আখেরাতের সুখ লাভ করা।"**

৪. প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতাগণ (وَاضِعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ):
এই শাস্ত্রের প্রবর্তক কে, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

- **তাত্ত্বিক ও সংকলক হিসেবে:** উসূলুল ফিকহকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রথম কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেন **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.)**। তাঁর রচিত **'আর-রিসালাহ'** হলো উসূলের প্রথম গ্রন্থ।

- **ব্যবহারিক প্রয়োগকারী হিসেবে:** ফিকহী বিধান বের করার ক্ষেত্রে উসুলের নীতিমালা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন **ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)**। তিনি এবং তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ফিকহ সংকলনের সময় এই উসুলগুলো প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম বাযদাবি (রহ.) হানাফি মাজহাবের এই উসুলগুলোকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

৫. উৎস (مَنْبَعُهُ):
উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রটি মূলত তিনটি প্রধান উৎস থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে:

- **ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব):** আল্লাহর একত্ববাদ, সিফাত এবং ওহী সত্য হওয়ার বিশ্বাস থেকেই উসুলের জন্ম।
- **আরবি ভাষা (লুগাতুল আরাবিয়্যাহ):** যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ আরবি ভাষায়, তাই আরবি ব্যাকরণ (নাহু, সরফ, বালাঘাত) হলো উসুলের অন্যতম উৎস।
- **শরিয়তের বিধান (আল-আহকামুশ শারিইয়্যাহ):** হারাম, হালাল, মাকরুহ ইত্যাদি ধারণা থেকেই উসুলের আলোচনা বিকশিত হয়েছে।

৬. উপকারিতা (فَائِدَتُهُ):
এই শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বা গবেষক বহুবিধ উপকার লাভ করেন:

- **মুজতাহিদ হওয়ার যোগ্যতা:** এটি মানুষকে ইজতিহাদ বা গবেষণার যোগ্যতা দান করে।
- **ভ্রান্তি থেকে মুক্তি:** কুরআন ও সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- **দলিল জানা:** সাধারণ মানুষ কেবল হুকুম জানে, কিন্তু উসুল পাঠক জানেন সেই হুকুমটি কোন দলিলের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে।
- **সংশয় নিরসন:** বিরোধীদের আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয়।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, উসুলুল ফিকহ হলো শরিয়তের জ্ঞানবৃক্ষের শিকড় বা মূল। আর ফিকহ হলো সেই বৃক্ষের ফল। শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনি উসুল ছাড়া ফিকহ অস্তিত্বহীন। ইমাম বাযদাবি (রহ.) তাঁর কিতাবে এই উসুল শাস্ত্রকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য হেদায়েতের মশাল হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন-৪: উসুল শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শরীয়তের উসূল (মূলনীতি) কয়টি এবং সেগুলো কী কী? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

ما معنى الاصول لغة وشرعا ؟ اصول الشرع كم هي وما هى؟ بين بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান বা আহকাম আকাশ থেকে সরাসরি নাজিল হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কিছু দলিল বা উৎসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসগুলোকেই পরিভাষায় 'উসুল' বা মূলনীতি বলা হয়। মুজতাহিদগণ এই উৎসগুলো থেকেই শরিয়তের মাসআলা ইস্তিমবাত বা আহরণ করেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর কিতাবে এই উসুলগুলোর পরিচয় ও সংখ্যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নে উসুল শব্দের অর্থ এবং শরীয়তের মূলনীতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. উসুল শব্দের অর্থ (مَعْنَى الْأُصُولِ):

শব্দটি আরবি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর দুটি অর্থ রয়েছে:

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'উসুল' (أُصُولٌ) শব্দটি 'আসলুন' (أَصْلٌ)-এর বহুবচন। আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে আসল বলা হয়:

"مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ."

(যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয় বা যার ওপর অন্য বস্তু দণ্ডায়মান হয়।)

যেমন—দেওয়ালের জন্য ভিত্তি (Foundation) বা গাছের জন্য শিকড়। শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনি উসুল ছাড়া ফিকহ বা বিধান টিকে থাকে না।

- পারিভাষিক বা শরয়ী অর্থ (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'উসুল' বা 'উসুলে ফিকহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের সেই সব অকাট্য ও প্রধান দলিলসমূহ, যেখান থেকে ফিকহী বিধান বের করা হয়। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসকে সমষ্টিগতভাবে 'উসুলে শরিয়ত' বা শরীয়তের মূলনীতি বলা হয়।

২. শরীয়তের উসূল বা মূলনীতির সংখ্যা (عَدَدُ أُصُولِ الشَّرْعِ):

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট শরীয়তের মূলনীতি বা দলিল হলো মোট ৪টি। এই চারটি দলিলের বাইরে শরিয়তের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নেই।

তিনি বলেন:

" إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ هُوَ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ."

(নিশ্চয়ই শরীয়তের উসুল বা মূলনীতি তিনটি: কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমা। আর চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস, যা এই তিনটি উসুল থেকে নির্গত।)

৩. মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ (بَيَانُ الْأُصُولِ بِالتَّفْصِيلِ):

নিম্নে শরীয়তের চারটি উসূল বা মূলনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

- প্রথম উসুল: কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন (الْكِتَابُ):

এটি শরীয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস। এটি আল্লাহর কালাম, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে এবং যা মুতাওয়াতির বা সন্দেহাতীত সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

  - **মর্যাদা:** এটি অকাট্য বা 'কাতয়ী' দলিল। অন্য সকল দলিল কুরআনের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম বাযদাবী (রহ.) কুরআনের শাব্দিক ও অর্থগত দিক নিয়ে তাঁর কিতাবের প্রথমাংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

- দ্বিতীয় উসুল: আস-সুন্নাহ বা হাদিস (السُّنَّةُ):

শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ। সুন্নাহ বলতে রাসূল (সা.)-এর কথা (কওল), কাজ (ফেল) এবং সমর্থন (তাকরীর) কে বোঝায়।

  - **ভূমিকা:** সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। কুরআন যেখানে সংক্ষিপ্ত, সুন্নাহ সেখানে বিস্তারিত। ইমাম বাযদাবী (রহ.) সুন্নাহকে কুরআনের পরেই স্থান দিয়েছেন এবং মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদিসকে অকাট্য দলিলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

- তৃতীয় উসুল: ইজমায়ে উম্মত (إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ):

শরীয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা বা ঐকমত্য। যদি কোনো যুগে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো শরয়ী বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তবে তাকে ইজমা বলা হয়।

- **গুরুত্ব:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) বলেন, হক বা সত্য এই উম্মতের সাথে রয়েছে। তাই উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। এটি অস্বীকার করা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

- চতুর্থ উসুল: আল-কিয়াস (الْقِيَاسُ):

এটি শরীয়তের চতুর্থ দলিল। যখন কোনো নতুন সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমাতে পাওয়া যায় না, তখন মুজতাহিদগণ পূর্বের কোনো বিধানের ইল্লত বা কারণের সাথে মিল রেখে নতুন সমস্যার সমাধান বের করেন। একে কিয়াস বলে।

- **ইমাম বাযদাবীর দৃষ্টিভঙ্গি:** তিনি কিয়াসকে 'আসল' বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে একে 'মুসতাম্বাত' বা নির্গত দলিল বলেছেন। অর্থাৎ কিয়াস নিজে নিজে কোনো স্বাধীন দলিল নয়, বরং এটি ওপরের তিনটি দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা) থেকেই শক্তি গ্রহণ করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি আইন বা ফিকহ শাস্ত্র এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিতাবুল্লাহ হলো ভিত্তি, সুন্নাহ হলো তার ব্যাখ্যা, ইজমা হলো তার নিশ্চয়তা এবং কিয়াস হলো তার প্রসার বা শাখা-প্রশাখা। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এই চারটি উসুলকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন, যাতে মুজতাহিদগণ সঠিক পথে থেকে শরিয়তের বিধান আহরণ করতে পারেন। হানাফি মাজহাব এই চারটি দলিলের সমন্বয়েই গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৫: উসূল শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উসুলে শরীয়া (শরীয়তের মূলনীতি) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এবং শরীয়তের আসল কয়টি? চারটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) কেন কিয়াসের বিষয়টিকে আলাদা করেছেন এবং কেন তিনি এটিকে 'চতুর্থ আসল' বলেছেন?

ما معنى الأصل لغة وشرعا؟ وما هو المراد باصول الشرع وكم أصلا للشرع؟ بين وجه الضبط في الأربعة - ولم أفرد المصنف رحمه الله القياس ولم قال فيه : الأصل الرابع؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের ভিত্তি হলো 'উসুলুল ফিকহ'। এই শাস্ত্রটি শরীয়তের দলিলসমূহের পরিচয়, প্রকারভেদ এবং প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা করে। হানাফি

মাজহাবের মহান ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর কিতাবের শুরুতে 'উসুল' বা দলিলের পরিচয় এবং এর সংখ্যা নিয়ে অত্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি কিয়াসকে অন্য তিনটি দলিল থেকে পৃথক করে যে সূক্ষ্ম দর্শনের অবতারণা করেছেন, তা উসুল শাস্ত্রের এক অনন্য সংযোজন। নিম্নে প্রশ্নের আলোকে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. 'আসল' শব্দের অর্থ (مَعْنَى الْأَصْلِ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'আসল' (أَصْلٌ) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো মূল, গোড়া, ভিত্তি বা শিকড়। অভিধানের ভাষায়:

"مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ."

(যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।)

যেমন—দেওয়ালের জন্য ভিত্তি বা গাছের জন্য শিকড় হলো 'আসল'।

- পারিভাষিক অর্থ (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

শরীয়তের পরিভাষায় 'আসল' বা 'উসুলে ফিকহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই সকল দলিল বা প্রমাণপঞ্জি, যার মাধ্যমে শরিয়তের বিধান (যেমন—হালাল, হারাম, ফরজ) সাব্যস্ত হয়।

২. উসুলে শরীয়া ও তার সংখ্যা (أُصُولُ الشَّرْعِ وَعَدَدُهَا):

'উসুলে শরীয়া' বলতে শরীয়তের আহকাম বা বিধানের উৎসসমূহকে বোঝায়। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট শরীয়তের মূলনীতি বা আসল হলো ৪টি।

যথা:

১. কিতাবুল্লাহ (আল-কুরআন)।

২. সুন্নাহ (রাসূল সা.-এর হাদিস)।

৩. ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য)।

৪. আল-কিয়াস (যৌক্তিক সাদৃশ্য)।

৩. চারটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার যৌক্তিক কারণ (وَجْهُ الضَّبْطِ فِي الْأَرْبَعَةِ):

শরীয়তের দলিল কেন এই চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার পেছনে একটি চমৎকার বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি বা 'ওয়াজহে জবত' রয়েছে। যুক্তিটি নিম্নরূপ:

শরিয়তের দলিল হয় ওহী হবে, অথবা ওহী হবে না।

- **(ক) যদি ওহী হয়:** তবে তা দুই প্রকার।
    - যদি সেই ওহীর শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তা তিলাওয়াত করা হয়, তবে তা **'কিতাবুল্লাহ'** (কুরআন)।
    - আর যদি তার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কিন্তু শব্দ রাসূল (সা.)-এর হয় এবং তা নামাজে তিলাওয়াত করা না হয়, তবে তা **'সুন্নাহ'**।
- **(খ) যদি ওহী না হয়:** তবে তা মানুষের ইজতিহাদ বা গবেষণা হবে।
    - যদি সেই গবেষণা বা মতে সকল মুজতাহিদ একমত হন, তবে তা **'ইজমা'**।
    - আর যদি তা একক কোনো মুজতাহিদের গবেষণা হয় এবং তা মূল দলিলের সাথে সাদৃশ্য রাখে, তবে তা 'কিয়াস'।

এই যুক্তির আলোকেই শরীয়তের দলিল চারটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. কিয়াসকে পৃথক করার এবং 'চতুর্থ আসল' বলার কারণ (سَبَبُ إِفْرَادِ الْقِيَاسِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) কিতাবের ইবারতে প্রথমে তিনটি দলিলের (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা) কথা উল্লেখ করেছেন এবং এরপর আলাদাভাবে বলেছেন, "وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ هُوَ الْقِيَاسُ" (আর চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস)। তিনি কিয়াসকে প্রথম তিনটির সাথে মিলিয়ে 'চারটি' না বলে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন কেন? এর পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে:

- প্রথম কারণ: কিয়াস 'মুজহির', 'মুছবিত' নয় (الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ):

প্রথম তিনটি দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা) হলো বিধান 'সাব্যস্তকারী' বা প্রবর্তনকারী। এগুলোকে বলা হয় 'মুছবিত' (مُثْبِتٌ)। অর্থাৎ এগুলো সরাসরি হালাল-হারাম নির্ধারণ করে।

কিন্তু কিয়াস নিজে কোনো নতুন বিধান তৈরি করতে পারে না। কিয়াস কেবল ওপরের তিনটি দলিলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হুকুমকে 'প্রকাশ' করে দেয় মাত্র। একে বলা হয় 'মুজহির' (مُظْهِرٌ) বা প্রকাশকারী। যেহেতু কিয়াসের শক্তি প্রথম তিনটির চেয়ে কম এবং এটি নির্ভরশীল দলিল, তাই গ্রন্থকার একে আলাদা করেছেন।

- দ্বিতীয় কারণ: বিরোধীদের মতভেদ (خِلَافُ الْمُنْكِرِينَ):

প্রথম তিনটি দলিলের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। সকলেই এগুলোকে দলিল মানে। কিন্তু 'কিয়াস' দলিল হওয়া নিয়ে জাহিরি সম্প্রদায় এবং শিয়াদের কেউ কেউ আপত্তি করেছে। তারা কিয়াসকে শরীয়তের দলিল মানে না।

ইমাম বাজদাবি (রহ.) কিয়াসকে আলাদাভাবে 'চতুর্থ আসল' বলে একদিকে তাদের মত খণ্ডন করেছেন, অন্যদিকে বুঝিয়েছেন যে, যদিও এটি নিয়ে বিতর্ক আছে, তবুও আমাদের (হানাফিদের) মতে এটি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র ও অকাট্য মূলনীতি।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শরীয়তের চারটি দলিলকে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি কিয়াসকে অন্য তিনটি দলিল থেকে পৃথক করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়াস হলো শরীয়তের একটি যৌক্তিক হাতিয়ার, যা স্বাধীন নয় বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অনুগত। এই সূক্ষ্ম বিভাজন হানাফি উসুলের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। মুজতাহিদগণ এই চারটি দলিলের সমন্বয়েই শরীয়তের সকল সমস্যার সমাধান বের করেন।

প্রশ্ন-৬: 'কিতাব'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর শর্তগুলোর উপকারিতা স্পষ্ট করে উল্লেখ কর। তারপর বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর যে, কুরআন কি নযম (শব্দবিন্যাস) এবং মা'না (অর্থ) উভয়েরই নাম, নাকি নয়?

عرف الكتاب موضحا مع بيان فوائد قيوده - ثم بين تفصيلا هل القران اسم للنظم والمعنى جميعا ام لا؟

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উৎস হলো 'আল-কিতাব' বা পবিত্র কুরআন। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বা উসুল রচনার ক্ষেত্রে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) সর্বপ্রথম 'কিতাবুল্লাহ' দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। কারণ, এটি হলো 'আসলুল উসুল' বা সকল দলিলের মূল। শরীয়তের বিধান সঠিকভাবে আহরণ করার জন্য কিতাবুল্লাহর সঠিক সংজ্ঞা এবং এর হাকিকত (প্রকৃত সত্তা) জানা মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে কুরআন কি শুধুই অর্থের নাম, নাকি শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি— এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উসুলি আলোচনা। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১. 'কিতাব'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْكِتَابِ):

আভিধানিক অর্থে 'কিতাব' (كِتَابٌ) অর্থ হলো একত্রিত করা বা লেখা।

শরিয়তের পরিভাষায় ইমাম বাজদাবি (রহ.) কিতাবুল্লাহর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হলো:

الْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ."

(কিতাব হলো সেই কুরআন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাজিলকৃত, যা মাসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিখিত এবং যা রাসূল (সা.) থেকে সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত।)

২. সংজ্ঞার শর্তগুলোর উপকারিতা (فَوَائِدُ الْقُيُودِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ বা শর্ত (কাইদ) বিশেষ কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং কিছু বিষয়কে বাদ দিয়েছে। নিম্নে এর বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

- (ক) আল-মুনাজ্জাল (الْمُنَزَّلُ - নাজিলকৃত):

এই শর্তের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর নিজস্ব কথা বা সাধারণ মানুষের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা ওহী বা নাজিলকৃত নয়, তা কুরআন হতে পারে না।

- (খ) আলা রাসূলিল্লাহ (عَلَى رَسُولِ اللهِ - রাসূলের ওপর):

এই শর্তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাজিলকৃত কিতাবসমূহ (যেমন—তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর) বাদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোকে 'কিতাবুল্লাহ' বলা হলেও শরীয়তের পরিভাষায় 'আল-কিতাব' বা কুরআন বলা হয় না।

- (গ) আল-মাকতুব ফিল মাসাহিফ (الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ - মাসহাফে লিখিত):

এই শর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে দুই প্রকার ওহীকে বাদ দেওয়া হয়েছে:

১. হাদিসে কুদসি: যা আল্লাহর ওহী কিন্তু মাসহাফে বা কুরআনের মধ্যে লেখা হয়নি।

২. মানসুখুত তিলাওয়াহ: কুরআনের এমন কিছু আয়াত যা নাজিল হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তার তিলাওয়াত উঠিয়ে নিয়েছেন (রহিত করেছেন)। এগুলো মাসহাফে লিখিত না থাকায় এখন আর কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

- (ঘ) আল-মানকুল... মুতাওয়াতিরান (الْمَنْقُولُ مُتَوَاتِرًا - মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত):

এই শর্তের মাধ্যমে 'শায' বা বিরল কিরাতগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন—হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিছু কিরাত বা পঠনপদ্ধতি, যা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

এগুলো ফিকহী দলিল হতে পারে, কিন্তু 'কুরআন' হিসেবে গণ্য হবে না এবং নামাজে পড়া যাবে না।

৩. কুরআন কি নযম ও মা'না উভয়ের নাম? (هَلِ الْقُرْآنُ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى؟):

উসুলবিদদের মধ্যে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে যে, কুরআন কি শুধুমাত্র 'মা'না' (অর্থ)-এর নাম, নাকি 'নযম' (শব্দবিন্যাস) এবং 'মা'না'—উভয়ের সমষ্টির নাম?

- ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর অভিমত:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের হানাফি ফকিহদের বিশুদ্ধ মত হলো:

"الْقُرْآنُ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا."

(কুরআন হলো নযম বা নির্দিষ্ট শব্দবিন্যাস এবং মা'না বা অর্থ—উভয়ের সমষ্টির নাম।)

শুধুমাত্র অর্থকে কুরআন বলা যাবে না, আবার অর্থহীন শুধু শব্দকেও কুরআন বলা যাবে না। বরং সেই নির্দিষ্ট আরবি শব্দাবলী, যা নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে—তাই হলো কুরআন।

- দলিলসমূহ:

১. ই'জাজ বা অলৌকিকতা (الْإِعْجَازُ): আল্লাহ তাআলা আরবদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কুরআনের মতো একটি সূরা বানিয়ে আনার জন্য। এই চ্যালেঞ্জটি ছিল কুরআনের 'নযম' বা শব্দশৈলীর ওপর, শুধু অর্থের ওপর নয়। যদি শুধু অর্থই কুরআন হতো, তবে আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করলেও তা কুরআন হতো, কিন্তু তা সর্বসম্মতিক্রমে ভুল।

২. নামাজ বিশুদ্ধ হওয়া: নামাজে 'কিরাত' বা কুরআন পড়া ফরজ। ইজমায়ে উম্মত হলো, নামাজে অবশ্যই আরবি 'নযম' বা শব্দ পড়তে হবে। কেউ যদি অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ফার্সি বা বাংলায় অনুবাদ পড়ে, তবে তার নামাজ হবে না (ইমাম আবু হানিফার একটি পূর্ববর্তী মত বাদে, যা থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন বলে বিশুদ্ধ মত পাওয়া যায়)। এটি প্রমাণ করে যে, নযম বা শব্দও কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩. কুরআনের আয়াত: আল্লাহ বলেন, "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا" (নিশ্চয়ই আমি একে আরবি কুরআনরূপে নাজিল করেছি)। আরবি ভাষা শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। তাই শব্দ বাদ দিলে তা আর আরবি কুরআন থাকে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম বাজদাবি (রহ.) অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন যে, 'আল-কিতাব' বা কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর অন্তরে নাজিলকৃত সেই নির্দিষ্ট আরবি শব্দমালার নাম, যা মাসহাফে লিখিত এবং মুতাওয়াতির সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর নযম (শব্দ) এবং মা'না (অর্থ) দুটোই ওহী এবং দুটোই মিলেই কুরআনের পূর্ণাঙ্গ সত্তা গঠিত। তাই কুরআনের অনুবাদকে 'কুরআন' বলা জায়েজ নয় এবং তা দিয়ে নামাজও আদায় হবে না।

প্রশ্ন-৭: কুরআনের নযম ও মা'না দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ইমাম বাযদাবী (র) এগুলোর যে ভাগ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কী কী? স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা কর।

ما المراد بنظم القرآن ومعناه؟ وما أقسامهما التي ذكرها الامام البزدوى (رح) ؟ بين موضحا۔

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো শরিয়তের দলিলসমূহ। আর এই দলিলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান হলো 'কিতাবুল্লাহ' বা পবিত্র কুরআন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'উসূলুল বাজদাবি' গ্রন্থে কিতাবুল্লাহর আলোচনা করতে গিয়ে এর শব্দবিন্যাস (নযম) এবং অর্থ (মা'না) নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক গবেষণাধর্মী আলোচনা পেশ করেছেন। মুজতাহিদ বা ফকিহগণের জন্য এই নযম ও মা'নার প্রকারভেদ জানা অপরিহার্য, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই শরিয়তের হালাল-হারাম ও বিধি-বিধান নির্ণীত হয়। নিম্নে প্রশ্নের আলোকে নযম ও মা'নার পরিচয় এবং ইমাম বাজদাবি (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো।

১. নযম ও মা'নার পরিচয় (تَعْرِيفُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى):

- **নযম (النَّظْمُ):** 'নযম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গাঁথা বা বিন্যস্ত করা (যেমন পুতি দিয়ে মালা গাঁথা)। উসূলের পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের সেই নির্দিষ্ট আরবি শব্দমালা ও বাক্যবিন্যাসকে 'নযম' বলা হয়, যা আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নাজিল করেছেন। এটি কুরআনের বাহ্যিক কাঠামো বা দেহস্বরূপ।
- **মা'না (الْمَعْنَى):** 'মা'না' শব্দের অর্থ হলো মর্মার্থ বা উদ্দেশ্য। কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে হুকুম বা সংবাদ বুঝাতে চেয়েছেন, তাকে 'মা'না' বলা হয়। এটি কুরআনের প্রাণস্বরূপ।

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, কুরআন হলো নযম এবং মা'না—উভয়ের সমষ্টির নাম। কেবল অর্থকে কুরআন বলা যায় না, আবার অর্থহীন শব্দকেও কুরআন বলা যায় না।

২. ইমাম বাযদাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত নযম ও মা'নার শ্রেণিবিভাগ (أَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) কুরআনের শব্দাবলী থেকে সঠিক বিধান আহরণের জন্য নযম ও মা'নার আলোচনাকে প্রধান চারটি দিক বা দৃষ্টিকোণ (Wujuh) থেকে ভাগ করেছেন। প্রতিটি দিকের অধীনে আবার চারটি করে প্রকার রয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৪x৪ = ১৬টি প্রকার নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

নিম্নে এই চারটি প্রধান দিক ও তাদের প্রকারভেদগুলো ছক ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

প্রথম দিক: শব্দের গঠন ও অর্থের ব্যাপ্তি অনুযায়ী (فِي وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى):

শব্দটি কি একক অর্থের জন্য তৈরি, নাকি ব্যাপক অর্থের জন্য—এই ভিত্তিতে শব্দ ৪ প্রকার:

১. খাস (الْخَاصُّ): যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য গঠিত। (যেমন—জায়েদ)।

২. আম (الْعَامُّ): যা অনির্দিষ্ট বহু ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। (যেমন—মানুষ)।

৩. মুশতারাক (الْمُشْتَرَكُ): যে শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। (যেমন—'আইন' শব্দটি চোখ ও ঝরনা উভয় অর্থে আসে)।

৪. মুআওয়াল (الْمُؤَوَّلُ): মুশতরাক শব্দের একাধিক অর্থের মধ্য থেকে কোনো একটিকে যখন দলিলের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিক: শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি অনুযায়ী (فِي طَرِيقِ الْاِسْتِعْمَالِ):

শব্দটি কি তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নাকি রূপক অর্থে—এই ভিত্তিতে শব্দ ৪ প্রকার:

১. হাকিকত (الْحَقِيقَةُ): শব্দকে তার নিজস্ব বা মূল অর্থে ব্যবহার করা। (যেমন—'সিংহ' বলে পশু বোঝানো)।

২. মাজাজ (الْمَجَازُ): শব্দকে তার মূল অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা। (যেমন—'সিংহ' বলে বীর পুরুষ বোঝানো)।

৩. সরিহ (الصَّرِيحُ): যে শব্দের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

৪. কিনায়া (الْكِنَايَةُ): যে শব্দের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট বা গোপন থাকে।

তৃতীয় দিক: অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা অনুযায়ী (فِي ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ):

শব্দের অর্থ কতটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, তার ওপর ভিত্তি করে শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করে মোট ৮টি প্রকার বের করা হয়েছে:

- (ক) স্পষ্টতার দিক থেকে ৪ প্রকার:

১. জহির (الظَّاهِرُ): যা শুনলেই অর্থ বোঝা যায়।

২. নস (النَّصُّ): যার অর্থ বক্তার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রকাশ পায়।

৩. মুফাসসার (الْمُفَسَّرُ): যা এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

৪. মুহকাম (الْمُحْكَمُ): যা প্রবল শক্তিশালী এবং মানসুখ (রহিত) হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

- (খ) অস্পষ্টতার দিক থেকে ৪ প্রকার:

১. খফি (الْخَفِيُّ): যার অর্থ কিছুটা গোপন থাকে (যেমন—চোরের বিধানে পকেটমার)।

২. মুশকিল (الْمُشْكِلُ): যার অর্থ বুঝতে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়।

৩. মুজমাল (الْمُجْمَلُ): যার অর্থ বক্তার ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝা যায় না (যেমন—সালাত, যাকাত)।

৪. মুতাশাবিহ (الْمُتَشَابِهُ): যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না (যেমন—আলিফ-লাম-মীম)।

চতুর্থ দিক: অর্থ নির্গত করার পদ্ধতি অনুযায়ী (فِي وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى):

একটি বাক্য বা শব্দ থেকে বিধান কীভাবে বের হয়, তার ভিত্তিতে ৪ প্রকার:

১. ইবারাতুন নস (عِبَارَةُ النَّصِّ): শব্দের মূল গঠন থেকেই যে অর্থ বোঝা যায়।

২. ইশারাতুন নস (إِشَارَةُ النَّصِّ): শব্দের গঠন থেকে সরাসরি নয়, বরং ইঙ্গিত থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়।

৩. দালালাতুন নস (دَلَالَةُ النَّصِّ): ভাষার মর্মার্থ বা ইল্লতের ভিত্তিতে যে অর্থ বোঝা যায়।

৪. ইকতিজাউন নস (اِقْتِضَاءُ النَّصِّ): বাক্যকে অর্থবোধক করার জন্য কোনো উহ্য শব্দ মেনে নেওয়া।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর এই চতুবর্গীয় বিভাজন বা শ্রেণিকরণ (Classification) উসুল শাস্ত্রের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক সংযোজন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ এবং এর অর্থের গভীরতা অসীম। একজন ফকিহ যখন এই ১৬টি প্রকার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তখনই কেবল তিনি কুরআন থেকে সঠিক বিধান ইস্তিমবাত বা আহরণ করতে সক্ষম হন। হানাফি ফিকহের সমৃদ্ধি মূলত এই সুশৃঙ্খল উসুলি কাঠামোর ওপরই নির্ভরশীল।

প্রশ্ন-৮: গ্রন্থকার (র)-এর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর: "প্রথম প্রকার নযমের দিকসমূহ, যা কাঠামো ও ভাষার ভিত্তিতে হয়"। এই শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত চারটি দিকের সংজ্ঞা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

اشرح قول المصنف رحمه الله " القسم الاول في وجوه النظم صيغة ولغة" مع بيان تعريف - الاوجه الاربعة المذكورة تحت هذا العنوان بالامثلة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো 'কিতাবুল্লাহ' বা কুরআন। পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী থেকে শরিয়তের বিধান আহরণ করার জন্য ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) কুরআনের শব্দ বা 'নযম'-কে চারটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং বুনিয়াদি প্রকারটি হলো শব্দের গঠন ও ভাষাগত অর্থের ভিত্তিতে বিভাজন। গ্রন্থকার তাঁর কিতাবে "الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً" (প্রথম প্রকার নযমের দিকসমূহ, যা কাঠামো ও ভাষার ভিত্তিতে হয়) শিরোনাম দিয়ে এই আলোচনা শুরু করেছেন। নিম্নে গ্রন্থকারের এই উক্তির ব্যাখ্যা এবং এর অধীনে বর্ণিত চারটি প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. গ্রন্থকারের উক্তির ব্যাখ্যা (شَرْحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) যখন বলেন, "প্রথম প্রকার নযমের দিকসমূহ, যা কাঠামো ও ভাষার ভিত্তিতে হয়", তখন তিনি মূলত শব্দের 'ওয়াজ' (وَضْعٌ) বা গঠনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

- **তাৎপর্য:** এর অর্থ হলো, আরবি ভাষায় কোনো শব্দকে যখন তৈরি করা হয়েছে, তখন অভিধান বা লুগাত অনুযায়ী সেটি কতটুকু অর্থের জন্য তৈরি হয়েছে? শব্দটি কি একটি মাত্র অর্থের জন্য তৈরি (একবচন/নির্দিষ্ট), নাকি ব্যাপক অর্থের জন্য তৈরি (বহুবচন/ব্যাপক), নাকি একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য তৈরি?

- **সিগাহ ও লুগাহ:** 'সিগাহ' (صِيغَةً) অর্থ হলো শব্দের বাহ্যিক কাঠামো বা রূপ। আর 'লুগাহ' (لُغَةً) অর্থ হলো আভিধানিক প্রয়োগ। অর্থাৎ শরিয়তের বিধান দেখার আগে, কেবল ভাষাগত ও গঠনগত দিক থেকে শব্দটি কী অর্থ দেয়, তা নির্ণয় করাই এই প্রকারের মূল উদ্দেশ্য।

২. এই শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত চারটি দিক (الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) শব্দের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে শব্দকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো: ১. খাস, ২. আম, ৩. মুশতারাক এবং ৪. মুআওয়াল। নিম্নে উদাহরণসহ এদের সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

- **(ক) আল-খাস (الْخَاصُّ):**
  - **সংজ্ঞা:** 'খাস' অর্থ নির্দিষ্ট বা বিশেষ। পরিভাষায়—যে শব্দকে একক বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, তাকে 'খাস' বলে। এটি তার অর্থের মধ্যে অন্য কাউকে শরিক করে না।
  - **উদাহরণ:** ব্যক্তিবাচক নাম যেমন—**'জায়েদ'** (زَيْدٌ)। অথবা সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন—**'সালাসা'** (ثَلَاثَةٌ - তিন)। কুরআনে বলা হয়েছে, **"ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"** (তিনটি ঋতুস্রাব)। এখানে 'তিন' শব্দটি খাস, এর অর্থ সাড়ে তিনও হবে না, আড়াইও হবে না।
- **(খ) আল-আম (الْعَامُّ):**
  - **সংজ্ঞা:** 'আম' অর্থ ব্যাপক। পরিভাষায়—যে শব্দকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, তা একক কোনো অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনির্দিষ্টভাবে বহু ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে 'আম' বলে।
  - **উদাহরণ:** যেমন—**'আল-ইনসান'** (الْإِنْسَانُ - মানুষ) বা **'আর-রিজাল'** (الرِّجَالُ - পুরুষেরা)। কুরআনে বলা হয়েছে, **"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"** (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন)। এখানে 'আল-বাই' (ক্রয়-বিক্রয়) শব্দটি আম, যা সব ধরণের ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করে (যতক্ষণ না সুদের মতো কোনো কারণে তা হারাম হয়)।
- **(গ) আল-মুশতারাক (الْمُشْتَرَكُ):**
  - **সংজ্ঞা:** 'মুশতারাক' অর্থ অংশীদারিত্বমূলক বা যৌথ। পরিভাষায়—যে শব্দকে আরবি ভাষায় একাধিক ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে এবং সেই অর্থগুলোর মধ্যে কোনোটিই প্রাধান্য পাচ্ছে না, তাকে 'মুশতারাক' বলে। শ্রোতা বুঝতে পারে না বক্তা ঠিক কোন অর্থটি বুঝিয়েছেন।
  - **উদাহরণ:** আরবিতে **'আইন'** (عَيْنٌ) শব্দটি। এর অর্থ চোখ, ঝরনা, সূর্য, হাঁটু, গুপ্তচর বা সোনা—অনেক কিছুই হতে পারে। কুরআনে ব্যবহৃত **'কুরু'** (قُرُوءٍ) শব্দটি আরেকটি উদাহরণ। এর অর্থ 'তুহুর' (পবিত্রতা) এবং 'হায়েজ' (ঋতুস্রাব)—উভয়ই হতে পারে।

- **(ঘ) আল-মুআওয়াল (الْمُؤَوَّلُ):**

  - **সংজ্ঞা:** 'মুআওয়াল' অর্থ ব্যাখ্যাকৃত বা স্থিরকৃত। এটি মূলত 'মুশতারাক' শব্দেরই পরবর্তী পর্যায়। যখন কোনো মুশতারাক শব্দের একাধিক অর্থের মধ্য থেকে কোনো প্রবল ধারণার (গালিবে যন) ভিত্তিতে বা ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন সেই শব্দটিকে 'মুআওয়াল' বলা হয়।

  - **উদাহরণ:** যেমন—কুরআনের **'কুরূ'** (قُرُوءٍ) শব্দটি মুশতারাক ছিল। হানাফি ফকিহগণ ইজতিহাদ করে এর অর্থ নিয়েছেন 'হায়েজ' (ঋতুস্রাব), আর শাফেয়ীগণ অর্থ নিয়েছেন 'তুহুর' (পবিত্রতা)। এই যে একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা হলো, এই অবস্থায় শব্দটি হলো 'মুআওয়াল'।

৩. প্রকারগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক:
এই চারটি প্রকার মূলত অর্থের ব্যাপ্তির ওপর নির্ভরশীল:

- যদি অর্থ একটি হয় এবং নির্দিষ্ট হয় = **খাস**।
- যদি অর্থ বহু হয় এবং সবাই অন্তর্ভুক্ত থাকে = **আম**।
- যদি অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং অস্পষ্ট থাকে = **মুশতারাক**।
- যদি অস্পষ্টতা দূর করে একটি অর্থ ঠিক করা হয় = **মুআওয়াল**।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর এই শ্রেণিবিভাগটি উসুল শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। একজন মুজতাহিদকে প্রথমেই চিনতে হয় যে, কুরআনের শব্দটি কি খাস নাকি আম? যদি মুশতারাক হয়, তবে তাকে গবেষণার মাধ্যমে মুআওয়ালে পরিণত করতে হয়। শব্দের এই 'সিগাহ' (গঠন) ও 'লুগাহ' (ভাষা) জানা ছাড়া শরিয়তের সঠিক হুকুম বের করা অসম্ভব। এই চারটি প্রকারের মাধ্যমেই ফিকহী মাসআলার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-৯: 'খাস' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। তারপর উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। এরপর উদাহরণ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট কর যে, "খাস শব্দ সন্দেহাতীতভাবে ও নিশ্চিতরূপে 'মাখসূস'কে (নির্দিষ্ট বিষয়) অন্তর্ভুক্ত করে"।
عرف الخاص لغة وشرعا - ثم بين اقسامه بالتمثيل - ثم أوضح " ان اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة " بالتمثيل والتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের গঠন ও অর্থের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শব্দের গঠনের ভিত্তিতে যে চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান প্রকার হলো 'খাস' (الْخَاصُّ)। শরিয়তের অকাট্য বিধানগুলো সাধারণত খাস শব্দের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়। তাই খাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর হুকুম জানা মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য। নিম্নে প্রশ্নের আলোকে খাসের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. 'খাস'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْخَاصِّ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'খাস' শব্দটি 'খুসূসুন' (خُصُوصٌ) ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—নির্দিষ্ট করা, পৃথক করা বা বিশেষায়িত করা। এটি 'আম' বা ব্যাপকতার বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) খাসের সংজ্ঞায় বলেন:

"وَالْخَاصُّ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ."

(খাস হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা এককভাবে কোনো জানা বা নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।)

সহজ কথায়, যে শব্দ দ্বারা একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ বোঝা যায় এবং যাতে অন্য কোনো অর্থের অংশীদারিত্ব থাকে না, তাকে খাস বলে।

২. খাসের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْخَاصِّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) খাস শব্দকে তার অর্থের ব্যাপকতা বা সংকীর্ণতার ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) খাসুল আইন (خَاصُّ الْعَيْنِ) - নির্দিষ্ট ব্যক্তির খাস:

যখন শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।

  - *উদাহরণ:* **'জায়েদ'** (زَيْدٌ), **'মক্কা'** (مَكَّةُ)। এই নামগুলো নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি বা একটি স্থানকেই বোঝায়।

- (খ) খাসুন নাও (خَاصُّ النَّوْعِ) - নির্দিষ্ট প্রজাতির খাস:

যখন শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতি বা শ্রেণিকে এককভাবে বোঝায়।

  - *উদাহরণ:* **'রাজুলুন'** (رَجُلٌ - একজন পুরুষ), **'ফারাসুন'** (فَرَسٌ - একটি ঘোড়া)। এখানে 'পুরুষ' শব্দটি নারী থেকে আলাদা এবং নির্দিষ্ট, তাই এটি খাস।

- (গ) খাসুল জিন্স (خَاصُّ الْجِنْسِ) - নির্দিষ্ট জাতির খাস:

যখন শব্দটি কোনো ব্যাপক জাতির মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট জাতিসত্তাকে বোঝায়।

  - *উদাহরণ:* **'ইনসান'** (إِنْسَانٌ - মানুষ)। প্রাণিকুলের মধ্যে 'মানুষ' একটি নির্দিষ্ট জাতি। তাই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় 'ইনসান' শব্দটি খাস।

৩. খাসের হুকুম বা বিধানের ব্যাখ্যা (بَيَانُ حُكْمِ الْخَاصِّ):

প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যটি— "ان اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة" (নিশ্চয়ই খাস শব্দ তার নির্দিষ্ট অর্থকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই)—ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর একটি বিখ্যাত উসুল বা মূলনীতি।

এর তাৎপর্য হলো:

- **কাতয়ী বা অকাট্য:** খাস শব্দ যখন কোনো বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা যেই অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে, ঠিক সেই অর্থটিই প্রদান করে। এখানে অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা বা 'ইহতিমাল' থাকে না।

- **আমল করা ওয়াজিব:** খাস শব্দের ওপর আমল করা অপরিহার্য। একে বাতিল করা যায় না, যতক্ষণ না প্রবল কোনো দলিল দ্বারা তা মানসুখ (রহিত) বা তাবিল (ব্যাখ্যা) করা হয়।

- **সংশয়হীনতা:** খাস শব্দের অর্থে কোনো 'শুবাহ' বা সন্দেহ থাকে না। এটি জন্নী (ধারণামূলক) নয়, বরং ইয়াকিনী (নিশ্চিত)।

উদাহরণ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ (التمثيل والتفصيل):

- উদাহরণ ১: পবিত্র কুরআনের সংখ্যাবাচক শব্দ

আল্লাহ তাআলা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে বলেন:

"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"

(তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদেরকে তিন কুরু বা তিন হায়েজ পর্যন্ত বিরত রাখবে। - সূরা বাকারা: ২২৮)

এখানে **'সালাসা'** (ثَلَاثَةَ - তিন) শব্দটি একটি **'খাস'** শব্দ। সংখ্যাবাচক শব্দ সবসময় খাস হয়।

  - **বিশ্লেষণ:** 'তিন' শব্দটি অকাট্যভাবে 'তিন' সংখ্যাকেই বোঝায়। এটি আড়াইও বোঝায় না, সাড়ে তিনও বোঝায় না। তাই হানাফি মাজহাব মতে, ইদ্দত অবশ্যই পূর্ণ তিন হায়েজ হতে হবে। দুই হায়েজ বা তিনের কম হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে না। এখানে কম-বেশি করার কোনো সুযোগ নেই, কারণ খাস শব্দটি তার অর্থকে নিশ্চিতভাবে (কাতঈভাবে) সাব্যস্ত করেছে।

- উদাহরণ ২: যাকাতের নিসাব

হাদিস শরীফে এসেছে: "ফি কুল্লি আরবাঈনা শাতান শাতুন" (প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে)।

এখানে 'আরবাঈন' (চল্লিশ) এবং 'শাতুন' (একটি ছাগল) শব্দগুলো খাস।

  - **বিশ্লেষণ:** এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে হানাফি ফকিহগণ বলেন, যাকাতের জন্য নিসাব অবশ্যই পূর্ণ ৪০টি হতে হবে। ৩৯টি হলেও যাকাত আসবে না। কারণ 'চল্লিশ' শব্দটি খাস এবং এটি তার অর্থের ওপর অটল।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে 'খাস' হলো শরিয়তের বিধানের মেরুদণ্ড। খাস শব্দ তার অর্থ প্রকাশে এতটাই শক্তিশালী যে, এর বিপরীতে কোনো কিয়াস বা খবরুল ওয়াহিদ (একক হাদিস) গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি কুরআনের কোনো খাস হুকুমের সাথে খবরুল ওয়াহিদ বা কিয়াসের সংঘর্ষ হয়, তবে কুরআনের খাস হুকুমই প্রাধান্য পায়। কারণ খাস শব্দটি তার অর্থকে 'কাতঈ' বা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে, যা প্রশ্নে উদ্ধৃত বাক্যটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রশ্ন-১০: 'খাস'-এর সংজ্ঞা দাও এবং উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর। তারপর এর বিধান স্পষ্ট কর।

عرف الخاص مع بيان أقسامه بالتفصيل والتمثيل - ثم أوضح حكمه

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান নির্ণয়ে শব্দের অর্থ ও প্রয়োগরীতি জানা অপরিহার্য। উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের আলোচনা একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শব্দের গঠনগত দিক থেকে যে চারটি প্রকার বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে 'খাস' (الْخَاصُّ) বা নির্দিষ্ট শব্দ অন্যতম। কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বিধানগুলো সাধারণত খাস শব্দের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। তাই একজন মুজতাহিদ বা ফকিহ হওয়ার জন্য খাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর হুকুম বা বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা একান্ত জরুরি। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১. 'খাস'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْخَاصِّ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'খাস' শব্দটি আরবি 'খুসূসুন' (خُصُوصٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থে এর মানা হলো—নির্দিষ্ট করা, বিশেষায়িত করা বা আলাদা করা। এটি 'আম' (ব্যাপক)-এর বিপরীত শব্দ।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

হানাফি উসূল শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম, ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) খাসের সংজ্ঞায় বলেন:

"وَالْخَاصُّ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ."

(খাস হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা এককভাবে কোনো জানা বা সুনির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।)

সহজ কথায়, যে শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝা যায় এবং যাতে অন্য কোনো অর্থের অংশীদারিত্ব থাকে না, তাকে 'খাস' বলে। যেমন—'জায়েদ' নামটি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়, এটি খাস।

২. খাসের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْخَاصِّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, খাস শব্দ তার অর্থের ব্যাপ্তি বা স্তরের ওপর ভিত্তি করে মূলত তিন প্রকার। যথা:

- (ক) খাসুল আইন বা খাসুল ফারদ (خَاصُّ الْعَيْنِ / الْفَرْدِ):

যখন কোনো শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি সত্তা বা বস্তুকে বোঝানো হয়। এটি খাসের সবচেয়ে সংকীর্ণ স্তর।

  - **উদাহরণ:** ব্যক্তিবাচক নামসমূহ যেমন—**'মুহাম্মদ'** (সা.), **'জায়েদ'**, **'মক্কা'**। যখন 'জায়েদ' বলা হয়, তখন নির্দিষ্ট ওই ব্যক্তিটিকেই বোঝায়, অন্য কাউকে নয়।

- (খ) খাসুন নাও (خَاصُّ النَّوْعِ):

যখন কোনো শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা প্রজাতিকে (Species) বোঝানো হয়, যা তার উপরের ব্যাপক জাতি (Genus) থেকে আলাদা।

  - **উদাহরণ: 'রাজুলুন'** (رَجُلٌ - একজন পুরুষ) বা **'ফারাসুন'** (فَرَسٌ - একটি ঘোড়া)। 'পুরুষ' শব্দটি মানবজাতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি, তাই এটি নারীর তুলনায় খাস।

- (গ) খাসুল জিন্স (خَاصُّ الْجِنْسِ):

যখন কোনো শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট জাতিসত্তাকে (Genus) বোঝানো হয়, যা তার চেয়েও ব্যাপক কোনো সত্তা থেকে আলাদা।

  - **উদাহরণ: 'ইনসান'** (إِنْسَانٌ - মানুষ)। প্রাণিকুল বা 'হাইওয়ান'-এর তুলনায় 'মানুষ' একটি নির্দিষ্ট জাতি। তাই প্রাণীর তুলনায় মানুষ শব্দটি খাস।

৩. খাসের হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الْخَاصِّ):

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে খাসের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হানাফি মাজহাব মতে খাসের বিধান হলো:

"يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا وَيَقِينًا بِلَا شُبْهَةٍ."

(খাস শব্দ তার নির্দিষ্ট অর্থকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।)

বিধানের ব্যাখ্যা ও ফলাফল:

১. ওয়াজিবুল আমল: খাস শব্দ দ্বারা প্রমাণিত বিধানের ওপর আমল করা ওয়াজিব।

২. কাতয়ী দলিল: খাস শব্দটি 'কাতয়ী' বা নিশ্চিত দলিল হিসেবে গণ্য হয়। তাই এর বিপরীতে কোনো 'জন্নি' (ধারণামূলক) দলিল, যেমন—খবরে ওয়াহিদ (একক হাদিস) বা কিয়াস গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি কুরআনের কোনো খাস আয়াতের সাথে কোনো খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াসের সংঘর্ষ হয়, তবে কুরআনের খাস আয়াতই প্রাধান্য পাবে।

৩. ব্যাখ্যার সুযোগহীনতা: খাস শব্দের অর্থে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না, তাই এতে তাবিল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, যতক্ষণ না অন্য কোনো শক্তিশালী দলিল পাওয়া যায়।

বিধানের উদাহরণ (الْمِثَالُ عَلَى الْحُكْمِ):

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"

(আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদেরকে তিন কুরু বা তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে। - সূরা বাকারা: ২২৮)

এখানে **'সালাসা'** (ثَلَاثَةَ - তিন) শব্দটি একটি **'খাস'** শব্দ।

- **হুকুম:** যেহেতু 'তিন' শব্দটি খাস, তাই এটি অকাট্যভাবে তিন সংখ্যাকেই বোঝায়। হানাফি মাজহাব মতে, ইদ্দত পালন অবশ্যই পূর্ণ তিন হায়েজ হতে হবে। তিনের কম (যেমন—আড়াই বা দুই) হলে ইদ্দত পূর্ণ হবে না। যদিও শাফেয়ী মাজহাবে কিয়াসের ভিত্তিতে বা অর্থের ভিন্নতার কারণে কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু হানাফি মতে খাস শব্দের হুকুম অকাট্য হওয়ায় এখানে তিন সংখ্যাটিই চূড়ান্ত।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'খাস' বা নির্দিষ্ট শব্দ হলো শরিয়তের বিধানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এটি অর্থের দিক থেকে এতটাই শক্তিশালী যে, এটি মুজতাহিদের জন্য নিশ্চিত বা 'ইয়াকিনি' জ্ঞান দান করে। খাস শব্দের সঠিক প্রয়োগ ও বিধান না জানলে কুরআনের আয়াত থেকে ভুল বিধান বের করার সম্ভাবনা থাকে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর এই বিশ্লেষণ হানাফি ফিকহের দালিলিক ভিত্তিকে অত্যন্ত মজবুত করেছে।

প্রশ্ন-১১: 'আম'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর শর্তগুলোর উপকারিতা ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। তারপর 'আম' কে 'তাখসীস' (নির্দিষ্টকরণ) করার বিষয়ে তুমি যা জান, তা বিস্তারিত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

عرف العام مع بيان فوائد قيوده واقسامه - ثم بين ماذا تعرف عن تخصيص العام بالتفصيل والتمثيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের অর্থ ও ব্যাপ্তি নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শব্দের গঠনগত প্রকারভেদের মধ্যে 'খাস'-এর পরেই 'আম' (الْعَامُّ) বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য বিধান 'আম' বা সাধারণ শব্দের মাধ্যমে নাজিল হয়েছে। মুজতাহিদের জন্য আম শব্দের সংজ্ঞা, এর প্রকার এবং কখন একে 'তাখসীস' বা নির্দিষ্ট করা হয়, তা জানা অপরিহার্য। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. 'আম'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْعَامِّ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'আম' শব্দটি 'উমুম' (عُمُومٌ) থেকে এসেছে, যার অর্থ ব্যাপকতা, অন্তর্ভুক্তি বা শামিল করা।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) 'আম'-এর সংজ্ঞায় বলেন:

"الْعَامُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى".

(আম হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা শাব্দিক বা অর্থগতভাবে বহুসংখ্যক নামকৃত বস্তুকে বা একদল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।)

সহজ কথায়, যে শব্দ তার অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনির্দিষ্টভাবে বহু একককে শামিল করে নেয়, তাকে 'আম' বলে। যেমন—'ইনসান' (মানুষ), 'মুসলিমুন' (মুসলমানরা)।

২. সংজ্ঞার শর্ত ও তার উপকারিতা (قُيُودُ التَّعْرِيفِ وَفَوَائِدُهَا):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) সংজ্ঞার মধ্যে বিশেষ কিছু শর্ত বা 'কাইদ' ব্যবহার করেছেন:

- **"ইয়ানতাজিমু জাম'আন" (অন্তর্ভুক্ত করে বহুসংখ্যককে):** এই শর্তের মাধ্যমে 'খাস' বা নির্দিষ্ট শব্দকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, খাস শব্দ (যেমন—জায়েদ) একজনকে মাত্র বোঝায়, বহুজনকে নয়।

- **"মিনাল মুসাম্মায়াত" (নামকরণকৃত বস্তুসমূহ থেকে):** এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, শব্দটি সত্তাগতভাবেই বহু সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্যতা রাখে।

- **"লফজান আও মানান" (শাব্দিক বা অর্থগতভাবে):**
  - **শাব্দিক:** যেমন বহুবচন শব্দ 'মুসলিমুনা'।
  - **অর্থগত:** যেমন একবচন শব্দ 'মান' (যে) বা 'মা' (যা), যা দেখতে একবচন হলেও অর্থে বহুবচন বা ব্যাপক।

৩. 'আম'-এর প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْعَامِّ):

আম শব্দকে ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- **(ক) আম মাহফুজ (الْعَامُّ الْمَحْفُوظُ):** যে আম শব্দের মধ্যে এখনো কোনো তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণ করা হয়নি। এর ওপর আমল করা অকাট্য বা 'কাতয়ী'।
  - *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন, **"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"** (তোমাদের ওপর তোমাদের মাতাদের হারাম করা হয়েছে)। এখানে 'মাতাগণ' শব্দটি আম এবং সকল মায়ের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য, কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি।

- **(খ) আম মাখসুস (الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ):** যে আম শব্দ থেকে দলিলের মাধ্যমে কিছু সদস্যকে বের করে দেওয়া হয়েছে। হানাফি মতে এটি 'জন্নি' (ধারণামূলক) হয়ে যায়।
  - *উদাহরণ:* **"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"** (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন)। এটি আম, কিন্তু সুদের হাদিস দ্বারা রিবা বা সুদকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

- **(গ) আম উরিদা বিহিল খুসুস (الْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ):** শব্দটা আম, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য শুরু থেকেই খাস বা নির্দিষ্ট ছিল।

৪. তাখসীসুল আম বা 'আম'-এর নির্দিষ্টকরণ (تَخْصِيصُ الْعَامِّ):

- **সংজ্ঞা:** 'তাখসীস' অর্থ হলো নির্দিষ্ট করা বা আলাদা করা। পরিভাষায়—একটি আম শব্দ থেকে তার অন্তর্ভুক্ত কিছু এককে দলিলের ভিত্তিতে বের করে

দেওয়াকে **'তাখসীসুল আম'** বলা হয়। এর ফলে শব্দটি তার বাকি সদস্যদের ওপর প্রযোজ্য থাকে।

"قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ." (আম শব্দকে তার কিছু সদস্যের ওপর সীমাবদ্ধ করা।)

৫. তাখসীসের প্রকার ও উদাহরণ (أَنْوَاعُ التَّخْصِيصِ وَأَمْثِلَتُهَا):

তাখসীস দুইভাবে হতে পারে:

- (ক) মুত্তাসিল (সংযুক্ত দলিল দ্বারা):

যখন একই বাক্যে বা একই নিশ্বাসে আম শব্দের সাথে ব্যতিক্রম বা শর্ত যুক্ত থাকে। এর মধ্যে প্রধান হলো 'ইস্তিসনা' (ব্যতিক্রম)।

  - *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন,

"إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا..."

(নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে, কিন্তু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে... - সূরা আসর)

এখানে 'আল-ইনসান' (মানুষ) শব্দটি আম, কিন্তু 'ইল্লা' (ব্যতীত) শব্দ দিয়ে মুমিনদের তাখসীস বা আলাদা করা হয়েছে।

- (খ) মুনফাসিল (পৃথক দলিল দ্বারা):

যখন ভিন্ন কোনো আয়াত, হাদিস বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা আম শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়।

  - *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন, **"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ"** (তোমাদের ওপর মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করা হয়েছে)। এখানে 'মৃত প্রাণী' শব্দটি আম। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর হাদিস দ্বারা সমুদ্রের মাছ এবং টিড্ডি (ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ) কে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। এটি হলো হাদিস দ্বারা কুরআনের আম শব্দের তাখসীস।

তাখসীসের বিধান (হানাফি মতে):

হানাফি উসুল অনুযায়ী, কোনো আম শব্দকে তাখসীস করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা আর অকাট্য (কাতয়ী) থাকে না, বরং তা 'জন্নি' বা প্রবল ধারণামূলক হয়ে যায়। তাই তাখসীসকৃত আম দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত করা যায় না, তবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আম' এবং 'তাখসীস' উসুল শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনের অনেক আয়াত বাহ্যত ব্যাপক মনে হলেও শরিয়তের অন্য দলিলের মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ হতে পারে। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, একজন মুজতাহিদকে অবশ্যই আম ও খাসের পার্থক্য এবং তাখসীসের নীতিমালা জানতে হবে, নতুবা তিনি শরিয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারেন।

প্রশ্ন-১২: কোনো কিছু আদেশ করা কি তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়? নিষেধ কি নিষিদ্ধ কাজটিকে ফাসেদ (অবৈধ/বাতিল) হওয়া প্রমাণ করে? এ বিষয়ে আলেমদের মতামত কী? দলিলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

هل يقتضي الامر بالشيء نهيا عن ضده؟ وهل يدل النهي على فساد المنهى عنه؟ وما أراء العلماء فيه؟ بين بالادلة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা হলো 'আমর' (আদেশ) এবং 'নাহি' (নিষেধ)। শরিয়তের অধিকাংশ বিধি-বিধান এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। উসুলবিদদের মাঝে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে যে, যখন আল্লাহ কোনো কাজের আদেশ দেন, তখন কি তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করেন? আবার যখন কোনো কাজ নিষেধ করেন, তখন কি সেই কাজটি পুরোপুরি বাতিল বা ফাসেদ হয়ে যায়? ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর কিতাবে এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। নিম্নে প্রশ্নের দুটি অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলেমদের মতামত আলোচনা করা হলো।

১. কোনো কিছুর আদেশ কি তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়? (هَلِ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ؟):

এ বিষয়ে উসুলবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **মুতাজিলা ও আশাইরা সম্প্রদায়ের মত:** তাদের অনেকের মতে, কোনো কাজের আদেশ দেওয়া মানেই হলো তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করা। অর্থাৎ, 'আমর' এবং 'নাহি আন দিদ্দিহি' (বিপরীত থেকে নিষেধ) একই বিষয়। তাদের যুক্তি হলো, আদেশ পালন করা বিপরীত কাজ বর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়।
- **হানাফি মাজহাবের মত (ইমাম বাজদাবি রহ.):** ইমাম বাজদাবি (রহ.) এবং হানাফি উসুলবিদগণের মতে:

".الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ عَيْنَ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ، وَلَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَرَاهَةَ الضِّدِّ"

(কোনো কাজের আদেশ দেওয়া হুবহু তার বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করা নয়, তবে এটি বিপরীত কাজ অপছন্দনীয় বা মাকরুহ হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।)

ব্যাখ্যা: যখন আল্লাহ বলেন "নামাজ কায়েম কর", তখন এর মূল উদ্দেশ্য হলো নামাজ আদায় করা। নামাজ না পড়া বা অন্য কাজে লিপ্ত হওয়াটা এখানে মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে আদেশ পালন করতে হলে আবশ্যিকভাবে বিপরীত কাজ ছাড়তে হয়। তাই আদেশটি **'ইলতিজাম'** বা অপরিহার্যতা হিসেবে বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ বোঝায়, কিন্তু শাব্দিকভাবে নয়। তাই হানাফি মতে, আদেশের বিপরীত করাটা হারাম বা মাকরুহ তাহরিমি হয় আদেশের মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে।

২. নিষেধ কি নিষিদ্ধ কাজটির ফাসাদ (বাতিল হওয়া) প্রমাণ করে? (هَلِ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ؟):

এই অংশটি উসুলের অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। যখন শরিয়ত কোনো কাজ করতে নিষেধ করে (যেমন—জিনা করা, বা আজানের সময় কেনাবেচা করা), তখন সেই কাজটি যদি কেউ করে ফেলে, তবে কি তা শরঈ দৃষ্টিতে বাতিল (বাতিল) হবে, নাকি কাজটি কার্যকর হবে কিন্তু গুনাহ হবে?

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, **" النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مُطْلَقًا."** (নিষেধ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের ফাসাদ বা বাতিল হওয়া প্রমাণ করে)। অর্থাৎ, যা নিষিদ্ধ তা শরীয়তে ধর্তব্য নয়। যেমন—রোজার দিনে খাওয়া যেমন রোজা ভাঙ্গে, তেমনি আজানের সময় বেচাকেনা করলে সেই বিক্রিও বাতিল হবে।
- **হানাফি মাজহাবের মত (ইমাম বাজদাবি রহ.):** ইমাম বাজদাবি (রহ.) বলেন, নিষেধ সব সময় ফাসাদ বা কাজ বাতিল হওয়া প্রমাণ করে না। তিনি নিষেধকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:
  - **(ক) কুবহ লি-আইনিহি (قُبْحٌ لِعَيْنِهِ - সত্তাগত মন্দ):** যদি কাজটি নিজেই মন্দ হয় এবং শরীয়ত তাকে মূল থেকেই নিষেধ করে।
    - *উদাহরণ:* জিনা করা, মদ পান করা। এই ক্ষেত্রে নিষেধটি প্রমাণ করে যে কাজটি **'বাতিল'**। এর কোনো আইনি ফলাফল নেই।
  - **(খ) কুবহ লি-গাইরিহি (قُبْحٌ لِغَيْرِهِ - অন্য কারণে মন্দ):** কাজটি মূলত বৈধ, কিন্তু কোনো বাহ্যিক কারণে বা ভুল সময়ে করার কারণে তা নিষেধ করা হয়েছে।

- *উদাহরণ:* **ঈদের দিনে রোজা রাখা** অথবা **জুমআর আজানের সময় কেনাবেচা করা**।

- *হানাফি বিশ্লেষণ:* এখানে রোজা বা কেনাবেচা কাজটি সত্তাগতভাবে ভালো (হাসান)। কিন্তু 'ঈদের দিন' বা 'আজানের সময়'—এই গুণের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই হানাফি মতে, এই কাজগুলো **'ফাসেদ'** বা মাকরুহ হলেও আইনিভাবে কার্যকর হতে পারে।

- যেমন—আজানের সময় কেউ বেচাকেনা করলে সে গুনাহগার হবে, কিন্তু বিক্রিটা শুদ্ধ (সহিহ) হবে এবং মালের মালিকানা হস্তান্তরিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এটি বাতিল হবে।

৩. হানাফিদের দলিল (أَدِلَّةُ الْحَنَفِيَّةِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) যুক্তি দেন যে, কোনো কাজকে নিষেধ করার অর্থ হলো সেই কাজটি করার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং শরিয়ত সেটাকে কাজ হিসেবে গণ্য করে। যদি কাজটি শুরু থেকেই বাতিল বা অস্তিত্বহীন হতো, তবে তা নিষেধ করার কোনো মানেই হতো না।

"لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَقُدْرَةَ الْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ."

(কেননা নিষেধ দাবি করে যে, নিষিদ্ধ কাজটি কল্পনাযোগ্য এবং বান্দার তা করার ক্ষমতা আছে।)

তাই বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধ কাজগুলো (যেমন—ঋতুবতী নারীর রোজা) শরিয়তের দৃষ্টিতে 'প্রকল্পিত' বা অস্তিত্বশীল, কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা করা গুনাহ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, আদেশের বিপরীত কাজ করা নিষিদ্ধ হলেও তা আদেশের মূল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর নিষেধ সব সময় কাজকে বাতিল করে দেয় না। বিশেষ করে মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাব 'বাতিল' এবং 'ফাসিদ'-এর মধ্যে পার্থক্য করে এক যুগান্তকারী সমাধান দিয়েছে। নিষিদ্ধ কাজ গুনাহের কারণ হলেও, জাগতিক প্রয়োজনে অনেক সময় তার আইনি ফলাফল মেনে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন-১৩: 'নাহী' (নিষেধ) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। তারপর নাহীর প্রকারভেদ ও বিধান বিস্তারিত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

عرف النهى لغة وشرعا ثم بين أنواع النهي مع الحكم مفصلا وممثلا

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান প্রধানত দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: একটি হলো 'আমর' বা আদেশ, আর অপরটি হলো 'নাহী' (النَّهْيُ) বা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সা.) যে কাজগুলো করতে বারণ করেছেন, উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে তাকেই 'নাহী' বলা হয়। শরিয়তের হারামের সীমানা নির্ধারণ এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নাহী-এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর বিধান জানা অপরিহার্য। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) হানাফি উসূলের আলোকে নাহী-এর যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তা ফিকহ শাস্ত্রের এক অনন্য সম্পদ। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১. 'নাহী'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ النَّهْيِ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'নাহী' শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—বাধা দেওয়া, বারণ করা, ধমক দেওয়া বা বিরত রাখা। এটি 'আমর' (আদেশ)-এর বিপরীত। অভিধানে একে 'মান'উন' (مَنْعٌ) বা 'জাজরুন' (زَجْرٌ) বলা হয়। যে বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, আরবিতে তাকেও 'নুহিয়াহ' বলা হয়।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

উসূলবিদগণের মতে নাহী-এর সংজ্ঞা হলো:

"هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ."

(বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি করাকে নাহী বলা হয়।)

ব্যাখ্যা: এখানে 'ইস্তিলা' বা বড়ত্বের শর্তটি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো ছোট ব্যক্তি বড়কে বারণ করে, তবে তা নাহী নয়, বরং 'দোয়া' বা অনুরোধ। শরিয়তে নাহী হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে কোনো কাজ করতে নিষেধ করা।

২. নাহী-এর প্রকারভেদ (أَنْوَاعُ النَّهْيِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, নাহী বা নিষেধাজ্ঞা মূলত কাজের কদর্যতা বা 'কুবহ' (قُبْحٌ - মন্দ)-এর ওপর ভিত্তি করে দুই প্রকার। কারণ, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তা নিশ্চয়ই মন্দ। এই মন্দ দুই ধরনের হতে পারে:

- (ক) নাহী আনিল আফ'আলিল হিসসিয়্যাহ (নিষেধাজ্ঞা সত্তাগত মন্দ কাজের প্রতি):

একে পরিভাষায় 'কুবহ লি-আইনিহি' (قُبْحٌ لِعَيْنِهِ) বলা হয়। অর্থাৎ কাজটি নিজেই মন্দ এবং এর সত্তার মধ্যেই খারাবি রয়েছে। শরিয়ত আসার আগেও বিবেক একে মন্দ বলে রায় দেয়।

  - **উদাহরণ:** কুফরি করা, জিনা (ব্যভিচার) করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, মদ পান করা ইত্যাদি।

  - **হুকুম:** এই ধরনের কাজের হুকুম হলো—এগুলো **'বাতিল'** (بَاطِلٌ)। শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব বা বৈধতা নেই।

- (খ) নাহী আনিত তাসাররুফাতিশ শরইয়্যাহ (নিষেধাজ্ঞা শরঈ লেনদেনের প্রতি):

একে পরিভাষায় 'কুবহ লি-গাইরিহি' (قُبْحٌ لِغَيْرِهِ) বলা হয়। অর্থাৎ কাজটি মূলত ভালো বা বৈধ (হাসান), কিন্তু কোনো বাহ্যিক কারণ বা ভুল সময়ের কারণে তা মন্দ বা নিষিদ্ধ হয়েছে।

  - **উদাহরণ: ঈদের দিনে রোজা রাখা।**

    - *বিশ্লেষণ:* 'রোজা' রাখা মূলত একটি ইবাদত এবং ভালো কাজ। কিন্তু 'ঈদের দিন' আল্লাহ মেহমানদারি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন, তাই এই দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এখানে রোজা খারাপ নয়, 'সময়টি' একে নিষিদ্ধ করেছে।

  - **উদাহরণ ২: জুমআর আজানের সময় বেচাকেনা করা।**

    - *বিশ্লেষণ:* বেচাকেনা বা ব্যবসা হালাল কাজ। কিন্তু জুমআর নামাজের ডাক আসার পর বেচাকেনা করলে নামাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাই বাহ্যিক কারণে (নামাজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে) এটি নিষিদ্ধ হয়েছে।

৩. নাহী-এর বিধান বা হুকুম (حُكْمُ النَّهْيِ):

নাহী-এর প্রধান বিধান হলো কাজটি হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া। কিন্তু হানাফি উসুলে এর ফলাফলের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিভাজন রয়েছে:

- ১. হারাম ও গুনাহ (التَّحْرِيمُ وَالْإِثْمُ):

যেকোনো নাহী বা নিষেধাজ্ঞার প্রথম হুকুম হলো, কাজটি করলে বান্দা গুনাহগার হবে এবং আখেরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

- ২. বাতিল বনাম ফাসিদ (الْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ):

এখানেই হানাফি মাজহাবের স্বকীয়তা।

- যদি বিষয়টি **'কুবহ লি-আইনিহি'** হয় (যেমন—জিনা), তবে তা সম্পূর্ণ **'বাতিল'**। এর কোনো আইনি ফলাফল নেই।
- কিন্তু যদি বিষয়টি **'কুবহ লি-গাইরিহি'** হয় (যেমন—নিষিদ্ধ সময়ে বেচাকেনা), তবে হানাফি মতে কাজটি **'ফাসিদ'** (ত্রুটিপূর্ণ) হলেও দুনিয়াবি দৃষ্টিতে কার্যকর হতে পারে।
  - *উদাহরণ:* কেউ যদি আজানের সময় জমি বিক্রি করে, তবে সে গুনাহগার হবে (হারাম কাজ করার জন্য), কিন্তু জমিটির মালিকানা ক্রেতার কাছে চলে যাবে (বিক্রিটা বাতিল হবে না)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এটিও বাতিল হবে।

ইমাম বাযদাবী (র)-এর যুক্তি:

ইমাম বাজদাবি (রহ.) বলেন, আল্লাহ যখন কোনো লেনদেন (যেমন- রোজা বা বিক্রি) নিষেধ করেন, তখন বোঝা যায় বান্দার সেই কাজ করার ক্ষমতা আছে এবং কাজটি অস্তিত্বশীল। যদি কাজটি গোড়া থেকেই বাতিল হতো, তবে তা নিষেধ করার কোনো অর্থই হতো না। তাই বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধ কাজগুলো সত্তাগতভাবে 'সহিহ' বা শুদ্ধ হতে পারে, যদিও তা করা গুনাহ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'নাহী' কেবল কোনো কাজ থেকে বিরত থাকাই নয়, বরং এটি শরিয়তের হালাল-হারামের সীমারেখা। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) নাহী-কে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সব নিষেধ এক স্তরের নয়। কোনোটি কাজকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় (বাতিল), আবার কোনোটি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ (ফাসিদ) করে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যই হানাফি ফিকহকে ব্যবহারিক জীবনে অধিক বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।

প্রশ্ন-১৪: 'আমর'-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর এর প্রকারভেদ, বিধান এবং রূপগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

عرف الامر - ثم بين انواعه وحكمه / موجبه وصيغه بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের প্রাণবিন্দু হলো শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত আলোচনা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার প্রধান মাধ্যম হলো 'আমর' (اَلْأَمْرُ) বা আদেশসূচক বাক্য। শরিয়তের কোনো বিধান ফরজ নাকি ওয়াজিব, তা নির্ভর করে আমরের সঠিক বিশ্লেষণের ওপর। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) হানাফি উসুলের আলোকে আমরের সংজ্ঞা, বিধান এবং প্রকারভেদ নিয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. 'আমর'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْأَمْرِ):

- আভিধানিক অর্থ (اَلْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'আমর' শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো—আদেশ করা, হুকুম দেওয়া বা কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া। এর বহুবচন হলো 'আওয়ামির' (أَوَامِرُ)। এটি 'নাহি' (নিষেধ)-এর বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (اَلْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

উসূলবিদগণের পরিভাষায় আমরের সংজ্ঞা হলো:

"هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ: اِفْعَلْ."

(বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি 'করো' বা নির্দেশসূচক বাক্য বলাকে আমর বলে।)

শর্ত: আমরের জন্য **'ইস্তিলা'** (اِسْتِعْلَاءٌ) বা বড়ত্ব থাকা শর্ত। অর্থাৎ আদেশকারীকে অবশ্যই আদিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে মর্যাদায় বড় হতে হবে। যদি ছোট বড়কে বলে, তবে তা 'দোয়া' (অনুরোধ)। আর সমকক্ষ কেউ বললে, তা 'ইলতিমাস' (আবেদন)।

২. আমরের সিগাহ বা রূপসমূহ (صِيَغُ الْأَمْرِ):

আরবি ভাষায় আমর বা আদেশ বুঝানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দরূপ বা 'সিগাহ' ব্যবহৃত হয়। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে আমরের মূল সিগাহ হলো:

- **ইফ'আল (اِفْعَلْ) বা আমরের সিগাহ:** যেমন—**"أَقِيمُوا الصَّلَاةَ"** (তোমরা নামাজ কায়েম কর)। এখানে সরাসরি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে।

- **লামে আমর (لَامُ الْأَمْرِ):** মুজারে বা বর্তমান/ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়ার শুরুতে 'লাম' যুক্ত করে আদেশ দেওয়া। যেমন—**"وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"** (এবং তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে)।

- **ইসমু ফিলিল আমর (اِسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ):** এমন বিশেষ্য যা আদেশের অর্থ দেয়। যেমন—**"عَلَيْكُمْ"** (তোমাদের ওপর আবশ্যক)।

৩. আমরের হুকুম বা মোজিব (حُكْمُ الْأَمْرِ / مُوجِبُهُ):

'মজিব' অর্থ হলো আমর বা আদেশ কী ফলাফল বয়ে আনে। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে আমরের হুকুম নিম্নরূপ:

- **ওয়াজিব হওয়া (الْوُجُوبُ):** আমরের প্রধান হুকুম হলো, এটি আদিষ্ট ব্যক্তির ওপর কাজটিকে **'ওয়াজিব'** (আবশ্যক) করে দেয়। কোনো পারিপার্শ্বিক দলিল (কারিনা) ছাড়া এটি নফল বা মুস্তাহাব বোঝায় না।

- **একবার আদায় করা (الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ):** হানাফি মাজহাব মতে, আমরের শব্দ কেবল একবার কাজটি করার দাবি রাখে। এটি 'তাকরার' বা বারবার করার দাবি করে না, যতক্ষণ না অন্য কোনো দলিল পাওয়া যায়।

- **দায়মুক্ত হওয়া:** আদেশ পালন করার পর বান্দা সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৪. আমরের প্রকারভেদ (أَنْوَاعُ الْأَمْرِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) আদায়ের সময় ও পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে আমরের হুকুমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) আল-আদা (الْأَدَاءُ) - যথাসময়ে আদায়:

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদিষ্ট কাজটি হুবহু পালন করাকে 'আদা' বলে।

  - **আদায়ে কামিল (পূর্ণাঙ্গ আদায়):** যেমন—জামাতের সাথে ধীরস্থিরভাবে নামাজ পড়া।

  - **আদায়ে কাসির (ত্রুটিপূর্ণ আদায়):** যেমন—একাকী বা তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়া।

- (খ) আল-কাযা (الْقَضَاءُ) - সময়োত্তীর্ণ আদায়:

নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর মিসলে মাকুল (যৌক্তিক সাদৃশ্য) দ্বারা ওয়াজিব আদায় করাকে 'কাযা' বলে। যেমন—জোহরের নামাজ মাগরিবের ওয়াক্তে পড়া।

৫. আমরের তাৎক্ষণিকতা বনাম বিলম্ব (الْفَوْرُ وَالتَّرَاخِي):

আমর কি সাথে সাথে পালন করতে হবে, নাকি দেরিতে করার সুযোগ আছে?

- **হানাফি মত:** আমরের সিগাহ নিজে থেকে 'ফাওর' (তৎক্ষণাৎ) বা 'তরাখি' (বিলম্ব)—কোনোটিই নির্দিষ্ট করে না। তবে সময় যদি সংকীর্ণ হয় (যেমন—রমজানের রোজা), তবে তা তৎক্ষণাৎ আদায় করা জরুরি। আর সময় ব্যাপক হলে (যেমন—হজ্জ বা যাকাত), তা বিলম্বে আদায় করার সুযোগ থাকে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আমর' হলো শরিয়তের বিধানের মূল ভিত্তি। কুরআনে কারিমের শত শত আয়াত আমরের সিগাহ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। মুজতাহিদগণ এই আমরের শব্দাবলী গবেষণা করেই বের করেছেন কোনটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব আর কোনটি মুস্তাহাব। ইমাম বাজদাবি (রহ.) আমরের যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা হানাফি ফিকহের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা শরিয়তের পালনকে মানুষের জন্য সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত করেছে।

প্রশ্ন-১৫: 'নাসখ' কী? সুন্নাহ (হাদীস) দ্বারা কিতাব (কুরআন) নাসখ হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

ما هو النسخ؟ بين اختلاف الأئمة في نسخ الكتاب بالسنة

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের ক্রমবিকাশ ও বাস্তবায়নের ইতিহাসে 'নাসখ' (النَّسْخُ) বা রহিতকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজন ও যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের কোনো কোনো বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান নাজিল করেছেন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াটিকেই নাসখ বলা হয়। নাসখ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে অনেক সময় মানসুখ (রহিত) আয়াতের ওপর আমল করার মতো ভুল হতে পারে। উসুলবিদদের মাঝে একটি বড় বিতর্কের বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াত কি রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ বা হাদিস দ্বারা রহিত হতে পারে কি না? ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি

(রহ.) এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের সুচিন্তিত মত তুলে ধরেছেন। নিম্নে নাসখের পরিচয় ও ইমামগণের মতভেদ আলোচনা করা হলো।

১. নাসখ-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ النَّسْخِ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'নাসখ' শব্দটি আরবি। এর প্রধান দুটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে:

১. ইজালাহ (الْإِزَالَةُ): অর্থাৎ দূর করা বা বিলুপ্ত করা। যেমন—সূর্যের আলো ছায়াকে নাসখ (দূর) করে দেয়।

২. নাকল (النَّقْلُ): অর্থাৎ স্থানান্তর করা বা হুবহু অনুলিপি করা। যেমন বলা হয়—'নাসখতুল কিতাব' (আমি বইটি নকল করলাম)। তবে উসুলের পরিভাষায় প্রথম অর্থটিই (পরিবর্তন/রহিতকরণ) বেশি প্রযোজ্য।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে নাসখের সংজ্ঞা হলো:

"هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ كَانَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ."

(নাসখ হলো এমন একটি শরয়ী বিধানের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া, যা পূর্বের কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত ছিল এবং নতুন দলিলটি পূর্বের দলিলের পরে এসেছে।)

সহজ কথায়, পরবর্তী কোনো দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কোনো হুকুম বা বিধান বাতিল করাকে নাসখ বলে।

২. সুন্নাহ দ্বারা কিতাব (কুরআন) নাসখ হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ:

কুরআন দ্বারা কুরআন নাসখ হওয়া এবং সুন্নাহ দ্বারা সুন্নাহ নাসখ হওয়া—এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত। কিন্তু 'সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের আয়াত নাসখ হওয়া' (نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ) জায়েজ কি না, তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে। প্রধান দুটি মত নিচে তুলে ধরা হলো:

- প্রথম মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হলো, সুন্নাহ বা হাদিস দ্বারা কুরআন নাসখ করা জায়েজ নেই। কুরআন কেবল কুরআনের আয়াত দ্বারাই মানসুখ হতে পারে।

- **যুক্তি:** কুরআন হলো আল্লাহর কালাম এবং এর মর্যাদা সর্বোচ্চ। সুন্নাহর মর্যাদা কুরআনের পরে। শরিয়তের নিয়ম হলো—দুর্বল দলিল দ্বারা শক্তিশালী দলিল বাতিল করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"

(আমি কোনো আয়াত রহিত করলে তার চেয়ে উত্তম বা তার সমকক্ষ আয়াত আনি। - সূরা বাকারা: ১০৬)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সুন্নাহ কুরআনের চেয়ে উত্তম বা সমকক্ষ হতে পারে না, তাই সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত হবে না।

- দ্বিতীয় মত: ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদগণের অভিমত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম বাজদাবি (রহ.) এবং অধিকাংশ হানাফি উসুলবিদের মতে, সুন্নাহ দ্বারা কুরআন নাসখ করা জায়েজ এবং সম্ভব। তবে এর জন্য একটি কঠিন শর্ত রয়েছে।

- **শর্ত:** সেই সুন্নাহটি অবশ্যই **'মুতাওয়াতির'** (مُتَوَاتِرٌ) বা **'মাশহুর'** (مَشْهُورٌ) হতে হবে। 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) দ্বারা কুরআন নাসখ করা যাবে না।

- হানাফিদের দলিল ও যুক্তি:

১. উভয়টিই ওহী: কুরআন এবং সুন্নাহ—উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী। কুরআন হলো 'ওহী মাতলু' (পঠিত) আর সুন্নাহ হলো 'ওহী গায়ের মাতলু' (অপঠিত)। যেহেতু উৎস এক, তাই একটি দ্বারা অন্যটি রহিত হতে পারে।

২. খবরে ওয়াহিদের সীমাবদ্ধতা: হানাফিগণ বলেন, কুরআন হলো 'কাতয়ী' বা অকাট্য দলিল। আর খবরে ওয়াহিদ হলো 'জন্নি' বা ধারণামূলক দলিল। অকাট্য বিষয়কে ধারণামূলক দলিল দিয়ে বাতিল করা যায় না। তাই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআন মানসুখ হবে না। কিন্তু সুন্নাহ যখন মুতাওয়াতির বা মাশহুর স্তরে পৌঁছায়, তখন তা অকাট্যতার কাছাকাছি চলে যায়, ফলে তা দিয়ে কুরআন নাসখ করা বৈধ।

- উদাহরণ:

আল্লাহ তাআলা কুরআনে পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সূরা বাকারা: ১৮০)। কিন্তু পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-এর হাদিস "ল, ওসিয়্যাতা লি-ওয়ারিসিন" (উত্তরাধিকারীর জন্য কোনো ওসিয়ত নেই) দ্বারা সেই আয়াতটি মানসুখ

হয়ে গেছে। হানাফিদের মতে, এই হাদিসটি মাশহুর বা মুতাওয়াতির স্তরের, তাই এটি দ্বারা কুরআনের আয়াত মানসুখ হয়েছে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, নাসখের বিষয়টি শরিয়তের নমনীয়তা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কুরআনের সম্মানে সুন্নাহ দ্বারা নাসখ অস্বীকার করলেও, হানাফি ইমামগণ বাস্তবসম্মত দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে তা স্বীকার করেছেন। তবে হানাফি উসুলে কড়াকড়ি হলো, যেনতেন হাদিস দিয়ে কুরআন বাতিল করা যাবে না; বরং সেই হাদিসকে অবশ্যই মুতাওয়াতির বা মাশহুর হতে হবে, যা কুরআনের সাথে পাল্লা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে।

প্রশ্ন-১৬: 'যাহের' এবং 'নস'- এর সংজ্ঞা দাও। তারপর উদাহরণসহ তাদের বিধান ব্যাখ্যা কর।

عرف الظاهر والنص - ثم بين أحكامهما مع ايراد الامثلة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে পবিত্র কুরআনের আয়াত বা শব্দের অর্থ কতটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) অর্থের স্পষ্টতার (জহুরুল মা'না) ভিত্তিতে শব্দকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন: জাহির, নস, মুফাসসার ও মুহকাম। এর মধ্যে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি দুটি স্তর হলো 'জাহির' (الظَّاهِرُ) এবং 'নস' (النَّصُّ)। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে দুটিই স্পষ্ট, কিন্তু উসুলি দৃষ্টিতে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে বক্তার উদ্দেশ্যের (সিয়াকুল কালাম) ক্ষেত্রে। নিম্নে জাহির ও নস-এর সংজ্ঞা, উদাহরণ ও বিধান বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. 'জাহির'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'জাহির' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো—প্রকাশ্য, স্পষ্ট বা দৃশ্যমান। এটি 'বাতিন' (গোপন)-এর বিপরীত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ لِلسَّامِعِ بِصِيغَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى قَرِينَةٍ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَقِ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ."

(জাহির হলো এমন শব্দ বা বাক্য, যা শুনলেই শ্রোতা তার অর্থ বুঝতে পারে, কোনো চিন্তা-ভাবনা বা বাহ্যিক দলিলের প্রয়োজন হয় না। তবে মূল কথা হলো—বক্তা মূলত এই অর্থটি বোঝানোর জন্য কথাটি বলেননি; বরং এটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।)

২. 'নস'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ النَّصِّ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'নস' শব্দের অর্থ হলো—উঁচু করা, প্রকাশ করা বা চূড়ান্ত ফয়সালা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَظْهَرَ مِنَ الظَّاهِرِ، وَسِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ."

(নস হলো যার অর্থ জাহিরের চেয়েও বেশি স্পষ্ট এবং বক্তা মূলত এই অর্থটি বোঝানোর উদ্দেশ্যেই কথাটি বলেছেন।)

অর্থাৎ, নস-এর ক্ষেত্রে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বা 'মাকসাদ' জড়িয়ে থাকে।

৩. জাহির ও নস-এর পার্থক্য এবং উদাহরণ:

উভয়ের পার্থক্য বোঝার জন্য পবিত্র কুরআনের একটি বিখ্যাত আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

(আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। - সূরা বাকারা: ২৭৫)

- **জাহির (অপ্রধান উদ্দেশ্য):** এই আয়াতের শব্দগুলো শুনলে বোঝা যায় যে, **"ব্যবসা করা হালাল বা বৈধ"**। এটি স্পষ্ট অর্থ, তাই এটি 'জাহির'। কিন্তু আয়াতটি শুধু ব্যবসার বৈধতা জানানোর জন্য নাজিল হয়নি (কারণ ব্যবসার বৈধতা সবাই জানত)।
- **নস (প্রধান উদ্দেশ্য):** কাফেররা বলেছিল, "ব্যবসা তো সুদের মতোই"। তাদের এই দাবি খণ্ডন করতে এবং **"ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য"** বুঝিয়ে সুদকে হারাম ঘোষণা করতেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। তাই এখানে সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য বুঝানোটা হলো 'নস'।

৪. জাহির ও নস-এর হুকুম বা বিধান (أَحْكَامُهُمَا):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) উভয় প্রকারের জন্য সাধারণ ও বিশেষ কিছু বিধান উল্লেখ করেছেন:

- **সাধারণ বিধান (ওয়াজিবুল আমল):** জাহির এবং নস—উভয় প্রকার শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না কোনো দলিল দ্বারা তা রহিত (মানসুখ) বা নির্দিষ্ট (তাখসীস) হয়, ততক্ষণ এর অর্থের ওপর অটল থাকতে হবে। এগুলোর অর্থ নিশ্চিত (ইয়াকিনি) হয়, তবে ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে।

- বিশেষ বিধান (তারজিহ বা অগ্রাধিকার):

যদি কোনো বিষয়ে জাহির এবং নস-এর মধ্যে সংঘর্ষ (তাআরুজ) বা বিরোধ দেখা দেয়, তবে 'নস'-কে 'জাহির'-এর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

  - **কারণ:** নস-এর মধ্যে বক্তার 'উদ্দেশ্য' (কাসদ) থাকে, যা জাহিরের মধ্যে গৌণ থাকে। আর যার মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে, তা বেশি শক্তিশালী।

অগ্রাধিকারের উদাহরণ:

- **জাহির:** কুরআনে বলা হয়েছে, **"ফানকাহু মা তবা লাকুম"** (তোমাদের পছন্দমতো নারীদের বিবাহ কর)। এখানে সংখ্যা উল্লেখ না করায় 'জাহির' অর্থ হলো যত খুশি বিয়ে করা যায়।

- **নস:** কিন্তু পরের অংশেই বলা হয়েছে **"মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা"** (দুই, তিন অথবা চার)। এখানে 'চার'-এর সীমাবদ্ধতা আরোপ করাটাই ছিল আয়াতের মূল উদ্দেশ্য বা 'নস'।

- **সিদ্ধান্ত:** যেহেতু জাহির (অসীম সংখ্যা) এবং নস (চারের সীমা)-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাই হানাফি উসুল অনুযায়ী নস প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ চারটির বেশি বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, জাহির এবং নস উসুলুল ফিকহের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কুরআনের আয়াত থেকে সঠিক বিধান বের করতে হলে মুজতাহিদকে বুঝতে হয় কোনটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্য (নস) আর কোনটি প্রাসঙ্গিক অর্থ (জাহির)। হানাফি মাজহাবের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ফিকহী মাসআলা সমাধানে এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৬: 'যাহের' এবং 'নস'- এর সংজ্ঞা দাও। তারপর উদাহরণসহ তাদের বিধান ব্যাখ্যা কর।

عرف الظاهر والنص - ثم بين أحكامهما مع ايراد الامثلة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে পবিত্র কুরআনের আয়াত বা শব্দের অর্থ কতটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) অর্থের স্পষ্টতার (জহুরুল মা'না) ভিত্তিতে শব্দকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন: জাহির, নস, মুফাসসার ও মুহকাম। এর মধ্যে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি দুটি স্তর হলো 'জাহির' (الظَّاهِرُ) এবং 'নস' (النَّصُّ)। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে দুটিই স্পষ্ট, কিন্তু উসুলি দৃষ্টিতে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, বিশেষ করে বক্তার উদ্দেশ্যের (সিয়াকুল কালাম) ক্ষেত্রে। নিম্নে জাহির ও নস-এর সংজ্ঞা, উদাহরণ ও বিধান বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. 'জাহির'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'জাহির' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো—প্রকাশ্য, স্পষ্ট, উন্মুক্ত বা দৃশ্যমান। এটি 'বাতিন' (গোপন)-এর বিপরীত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ لِلسَّامِعِ بِصِيغَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى قَرِينَةٍ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَقِ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ."

(জাহির হলো এমন শব্দ বা বাক্য, যা শুনলেই শ্রোতা তার অর্থ বুঝতে পারে, কোনো চিন্তা-ভাবনা বা বাহ্যিক দলিলের প্রয়োজন হয় না। তবে মূল কথা হলো—বক্তা মূলত এই অর্থটি বোঝানোর জন্য কথাটি বলেননি; বরং এটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।)

২. 'নস'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ النَّصِّ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'নস' শব্দের অর্থ হলো—উঁচু করা, প্রকাশ করা বা চূড়ান্ত ফয়সালা।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَظْهَرَ مِنَ الظَّاهِرِ، وَسِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ."

(নস হলো যার অর্থ জাহিরের চেয়েও বেশি স্পষ্ট এবং বক্তা মূলত এই অর্থটি বোঝানোর উদ্দেশ্যেই কথাটি বলেছেন।)

অর্থাৎ, নস-এর ক্ষেত্রে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বা 'মাকসাদ' জড়িয়ে থাকে।

৩. জাহির ও নস-এর পার্থক্য এবং উদাহরণ:

উভয়ের পার্থক্য বোঝার জন্য পবিত্র কুরআনের একটি বিখ্যাত আয়াতই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

(আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। - সূরা বাকারা: ২৭৫)

- **জাহির (অপ্রধান উদ্দেশ্য):** এই আয়াতের শব্দগুলো শুনলে বোঝা যায় যে, **"ব্যবসা করা হালাল বা বৈধ"**। এটি স্পষ্ট অর্থ, তাই এটি 'জাহির'। কিন্তু আয়াতটি শুধু ব্যবসার বৈধতা জানানোর জন্য নাজিল হয়নি (কারণ ব্যবসার বৈধতা সবাই জানত)।

- **নস (প্রধান উদ্দেশ্য):** কাফেররা বলেছিল, "ব্যবসা তো সুদের মতোই"। তাদের এই দাবি খণ্ডন করতে এবং **"ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য"** বুঝিয়ে সুদকে হারাম ঘোষণা করতেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। তাই এখানে সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য বুঝানোটা হলো 'নস'।

৪. জাহির ও নস-এর হুকুম বা বিধান (أَحْكَامُهُمَا):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) উভয় প্রকারের জন্য সাধারণ ও বিশেষ কিছু বিধান উল্লেখ করেছেন:

- **সাধারণ বিধান (ওয়াজিবুল আমল):** জাহির এবং নস—উভয় প্রকার শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না কোনো দলিল দ্বারা তা রহিত (মানসুখ) বা নির্দিষ্ট (তাখসীস) হয়, ততক্ষণ এর অর্থের ওপর অটল থাকতে হবে। এগুলোর অর্থ নিশ্চিত (ইয়াকিনি) হয়, তবে ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে।

- বিশেষ বিধান (তারজিহ বা অগ্রাধিকার):

যদি কোনো বিষয়ে জাহির এবং নস-এর মধ্যে সংঘর্ষ (তাআরুজ) বা বিরোধ দেখা দেয়, তবে 'নস'-কে 'জাহির'-এর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

- **কারণ:** নস-এর মধ্যে বক্তার 'উদ্দেশ্য' (কাসদ) থাকে, যা জাহিরের মধ্যে গৌণ থাকে। আর যার মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে, তা বেশি শক্তিশালী।

অগ্রাধিকারের উদাহরণ:

- **জাহির:** কুরআনে বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, **"ফানকাহু মা তবা লাকুম"** (তোমাদের পছন্দমতো নারীদের বিবাহ কর)। এখানে সংখ্যা উল্লেখ না করায় 'জাহির' অর্থ হলো যত খুশি বিয়ে করা যায়।
- **নস:** কিন্তু পরের অংশেই বলা হয়েছে **"মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা"** (দুই, তিন অথবা চার)। এখানে 'চার'-এর সীমাবদ্ধতা আরোপ করাটাই ছিল আয়াতের মূল উদ্দেশ্য বা 'নস'।
- **সিদ্ধান্ত:** যেহেতু জাহির (অসীম সংখ্যা) এবং নস (চারের সীমা)-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, তাই হানাফি উসুল অনুযায়ী নস প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ চারটির বেশি বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, জাহির এবং নস উসুলুল ফিকহের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। কুরআনের আয়াত থেকে সঠিক বিধান বের করতে হলে মুজতাহিদকে বুঝতে হয় কোনটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্য (নস) আর কোনটি প্রাসঙ্গিক অর্থ (জাহির)। হানাফি মাজহাবের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ফিকহী মাসআলা সমাধানে এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৭: 'আদা' ও 'কাযা'- এর সংজ্ঞা দাও। যে কারণে 'আদা' ওয়াজিব হয়, সে কারণে কি 'কাযা'ও ওয়াজিব হয়? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, তা ব্যাখ্যা কর।

عرف الاداء والقضاء - هل يجب القضاء بما يجب به الاداء؟ وما الاختلاف فيه بين الائمة؟ بين

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের ইবাদত ও বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে 'সময়' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মহান আল্লাহ প্রতিটি ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ইবাদত পালন করা বা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পালন করার ওপর ভিত্তি করে ফিকহ শাস্ত্রে বিধানকে 'আদা' (الْأَدَاءُ) ও 'কাযা' (الْقَضَاءُ)—এই দুই ভাগে

ভাগ করা হয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর 'উসুলুল বাজদাবি' গ্রন্থে 'আমর' বা আদেশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কাযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ বা 'সাবাব' (Cause) নিয়ে উসূলবিদদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মতভেদ রয়েছে, তা ফিকহ শাস্ত্রের এক তাত্ত্বিক ভিত্তি। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১. 'আদা' ও 'কাযা'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ):

- (ক) আল-আদা (الْأَدَاءُ):

আভিধানিক অর্থ হলো—পরিশোধ করা, আদায় করা বা প্রাপকের হক পৌঁছিয়ে দেওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায়:

"تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا."

(শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিষয়টি হুবহু আদায় করাকে 'আদা' বলে।)

উদাহরণ: জোহরের নামাজ জোহরের নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা।

- (খ) আল-কাযা (الْقَضَاءُ):

আভিধানিক অর্থ হলো—ফয়সালা করা, পূরণ করা বা ঋণ শোধ করা।

শরিয়তের পরিভাষায়:

"تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ."

(নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ওয়াজিবের অনুরূপ বা 'মিসল' আদায় করাকে 'কাযা' বলে।)

উদাহরণ: জোহরের নামাজ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর মাগরিব বা এশার সময় আদায় করা।

২. কাযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নিয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য (اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي مُوجِبِ الْقَضَاءِ):

উসুল শাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো: যেই নির্দেশের কারণে কোনো ইবাদত যথাসময়ে (আদা) পালন করা ওয়াজিব হয়েছিল, সেই একই নির্দেশের কারণেই কি সময় পার হওয়ার

পর তা (কাযা) পালন করা ওয়াজিব হয়? নাকি কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য ভিন্ন কোনো নতুন দলিল বা আদেশের প্রয়োজন হয়?

এ বিষয়ে উসূলবিদদের মধ্যে প্রধান দুটি মত রয়েছে:

- প্রথম মত: হানাফি উসূলবিদ ও ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর অভিমত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম বাজদাবি (রহ.)-সহ অধিকাংশ হানাফি উসূলবিদের মতে:

"الْقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْأَدَاءُ."

(যে কারণে বা যে দলিলের ভিত্তিতে আদা ওয়াজিব হয়, সেই একই দলিলের ভিত্তিতেই কাযা ওয়াজিব হয়।)

অর্থাৎ, কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কুরআনে বা হাদিসে নতুন কোনো নির্দেশের প্রয়োজন নেই।

হানাফিদের যুক্তি:

যখন আল্লাহ কোনো ইবাদতের আদেশ দেন (যেমন—"নামাজ কায়েম কর"), তখন সেই নির্দেশটি বান্দার জিম্মায় বা ঘাড়ে একটি 'ঋণ' (Dayn) হিসেবে চেপে বসে। নির্ধারিত 'সময়টি' হলো সেই ঋণ শোধ করার একটি মানদণ্ড বা সুযোগ মাত্র। যদি সময় পার হয়ে যায়, তবুও ঋণটি বান্দার জিম্মায় থেকেই যায়। তাই প্রথম আদেশের কারণেই পরবর্তীতে তা (কাযা হিসেবে) আদায় করা ওয়াজিব থাকে। নতুন দলিলের প্রয়োজন নেই।

- দ্বিতীয় মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে:

"الْقَضَاءُ يَجِبُ بِدَلِيلٍ جَدِيدٍ (بِأَمْرٍ جَدِيدٍ)."

(কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নতুন দলিল বা নতুন নির্দেশের প্রয়োজন।)

শুধুমাত্র পূর্বের আদেশ দ্বারা কাযা ওয়াজিব হয় না।

শাফেয়ীদের যুক্তি:

তাঁদের যুক্তি হলো, আদেশটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শর্তযুক্ত ছিল। যখন সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন সেই নির্দিষ্ট আদেশের মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। এখন অসময়ে সেটি

আদায় করতে হলে শরিয়তের পক্ষ থেকে নতুন করে আদেশ (যেমন হাদিসে কাযার নির্দেশ) থাকতে হবে। যদি নতুন দলিল না থাকে, তবে কাযা করা যাবে না।

৩. মতপার্থক্যের ফলাফল (Fruition of the Difference):

এই মতভেদের কারণে ফিকহী মাসআলায় ভিন্নতা দেখা দেয়।

- উদাহরণ (রোজা বনাম নামাজ):

রোজার ক্ষেত্রে কুরআনে বলা হয়েছে, "যে অসুস্থ বা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে" (সূরা বাকারা)। এখানে কাযার জন্য নতুন দলিল আছে। কিন্তু নামাজের কাযার ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত নেই (হাদিসে আছে)।

- **হানাফি মতে:** নামাজের কাযার জন্য আলাদা আয়াতের প্রয়োজন নেই। **"আকিমিস সালাহ"** (নামাজ কায়েম কর)—এই মূল আদেশই প্রমাণ করে যে, ওয়াক্ত চলে গেলেও নামাজ পড়তেই হবে।
- **শাফেয়ী মতে:** যদি নামাজের কাযার ব্যাপারে আলাদা হাদিস না থাকত, তবে শুধু মূল আয়াত দিয়ে কাযা সাব্যস্ত হতো না।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, 'আদা' হলো আল্লাহর হক যথাসময়ে আদায় করা, আর 'কাযা' হলো বিলম্বিত আদায়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর আদেশের শক্তি এতই প্রবল যে, সময় পার হয়ে গেলেও সেই আদেশ বাতিল হয় না। বান্দার জিম্মায় তা ঋণ হিসেবে থেকে যায়, যা আদায় করা অপরিহার্য। হানাফি মাজহাবের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইবাদতের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় অধিকতর শক্তিশালী।

প্রশ্ন-১৮: 'আদা' ও 'ক্বাযা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং তাদের প্রকারভেদগুলো বিস্তারিত উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

عرف الاداء والقضاء مع ذكر انواعهما مفصلا وممثلا

উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামি শরিয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ প্রতিটি ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে ইবাদত পালন করা বা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পালন করার ওপর ভিত্তি করে ফিকহ শাস্ত্রে বিধানকে 'আদা' (الْأَدَاءُ) ও 'কাযা' (الْقَضَاءُ)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইমাম

ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর 'উসুলুল বাজদাবি' গ্রন্থে এগুলোর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যা একজন ফকিহ বা মুজতাহিদের জন্য জানা অপরিহার্য।

১. 'আদা'-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ (تَعْرِيفُ الْأَدَاءِ وَأَنْوَاعُهُ):

- **সংজ্ঞা:**

  - **আভিধানিক অর্থ:** 'আদা' শব্দের অর্থ হলো—পরিশোধ করা, হক পৌঁছিয়ে দেওয়া বা আদায় করা।

  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا."

(শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিষয়টি হুবহু আদায় করাকে 'আদা' বলে।)

- প্রকারভেদ:

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে 'আদা' প্রধানত তিন প্রকার:

  - (ক) আদায়ে কামিল (أَدَاءٌ كَامِلٌ - পূর্ণাঙ্গ আদায়):

যখন ওয়াজিব কাজটি তার নির্ধারিত সময়ে সমস্ত গুণাগুণ, শর্ত ও সুন্নাহসহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়।

    - **উদাহরণ:** জোহরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে **জামাতের সাথে** তাকবীরে উলার সহিত আদায় করা। এটিই আদার সর্বোচ্চ স্তর।

  - (খ) আদায়ে কাসির (أَدَاءٌ قَاصِرٌ - অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আদায়):

যখন ওয়াজিব কাজটি নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে কিছু গুণের ঘাটতি থাকে বা কোনো ওয়াজিব ছুটে যায়।

    - **উদাহরণ:** জোহরের নামাজ ওয়াক্তের মধ্যে **একাকী** আদায় করা। জামাত তরক করার কারণে এটি 'কাসির' বা ত্রুটিপূর্ণ, যদিও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

  - (গ) আদায়ে শাবিহ বিল কাযা (أَدَاءٌ شَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ - কাযা সদৃশ আদায়):

যা মূলত আদা, কিন্তু কোনো এক দিক থেকে তা কাযার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

- **উদাহরণ:** কোনো ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমামের সাথে রুকু পেল না, বরং ইমাম সালাম ফেরানোর পর সে তার বাকি নামাজ আদায় করল (লাহিক)। তার এই নামাজ আদায় করাটা 'আদা', কিন্তু যেহেতু সে ইমামের পেছনের অংশটুকু একা পড়ছে (যা ইমামের সাথে পড়ার কথা ছিল), তাই এটি কাযার মতো মনে হয়।

২. 'কাযা'-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ (تَعْرِيفُ الْقَضَاءِ وَأَنْوَاعُهُ):

- **সংজ্ঞা:**

  - **আভিধানিক অর্থ:** 'কাযা' অর্থ হলো—ফয়সালা করা, পূরণ করা বা ঋণ শোধ করা।

  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ."

(নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ওয়াজিবের অনুরূপ বা 'মিসল' আদায় করাকে 'কাযা' বলে।)

- প্রকারভেদ:

কাযা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে এটি তিন প্রকার:

  - (ক) কাযা বি-মিসলিন মা'কুল (قَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ - যৌক্তিক সাদৃশ্যপূর্ণ কাযা):

যখন ছুটে যাওয়া ইবাদতের কাযা হুবহু সেই ইবাদতের মতোই হয় এবং বুদ্ধি দ্বারা তা বোঝা যায়।

- **উদাহরণ:** কেউ রমজানের রোজা রাখতে পারল না, পরে সে অন্য সময়ে **রোজা রেখেই** তা পূরণ করল। এখানে 'রোজার' বদলা 'রোজা'—এটি যৌক্তিক এবং হুবহু মিলসম্পন্ন।

  - (খ) কাযা বি-মিসলিন গাইরি মা'কুল (قَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ - অযৌক্তিক সাদৃশ্যপূর্ণ কাযা):

যখন ছুটে যাওয়া ইবাদতের বদলা এমন কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, যা বাহ্যত মূল ইবাদতের মতো নয়, বরং শরিয়ত তা নির্ধারণ করেছে।

- **উদাহরণ:** অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম হলে তার জন্য **'ফিদিয়া'** (মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো) দেওয়া। এখানে 'রোজার' (উপবাস) বদলা

'খাবার'—এটি বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না (কারণ উপবাসের উল্টো খাওয়া), কিন্তু শরিয়ত একেই বদলা বা মিসল হিসেবে গণ্য করেছে।

- (গ) কাযা শাবিহ বিল আদা (قَضَاءٌ شَبِيهٌ بِالْأَدَاءِ - আদা সদৃশ কাযা):

যা মূলত কাযা, কিন্তু কোনো এক দিক থেকে তা আদার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

- **উদাহরণ:** ঈদের নামাজের তাকবীরগুলো। যদি কেউ ইমামের সাথে তাকবীরগুলো না পায়, তবে সে রুকুতে গিয়ে তা আদায় করে নেয়। এটি মূলত কাযা (সময় চলে যাওয়ার পর আদায়), কিন্তু নামাজের মধ্যেই হওয়ায় তা আদার মতো দেখায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আদা' ও 'কাযা' হলো আল্লাহর বিধান পালনের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। মুমিন বান্দার কর্তব্য হলো সর্বদা 'আদায়ে কামিল' বা পূর্ণাঙ্গভাবে যথাসময়ে ইবাদত পালন করার চেষ্টা করা। তবে মানবিক কারণে যদি সময় ছুটে যায়, তবে শরিয়ত 'কাযা' বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও রেখেছে, যাতে বান্দা দায়মুক্ত হতে পারে। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর এই সূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ ফিকহী মাসআলা সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৯: 'আমর' ও 'নাহী'-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর আমর ও নাহীর রূপগুলো উল্লেখ কর এবং তাদের মোজিব (যা ওয়াজিব করে) কী এবং এ বিষয়ে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা দলিলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা কর।

عرف الامر والنهي - ثم بين صيغ الأمر والنهي مع ذكر موجبهما والاختلاف فيه بالادلة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান দুটি স্তম্ভ হলো 'আমর' (আদেশ) এবং 'নাহী' (নিষেধ)। ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান—হোক তা করণীয় বা বর্জনীয়—মূলত এই দুই প্রকার বাক্যের মাধ্যমেই আরোপিত হয়েছে। মুজতাহিদের জন্য আমর ও নাহীর সংজ্ঞা, এদের নির্দিষ্ট রূপ বা 'সিগাহ' এবং এদের দাবি বা হুকুম (মোজিব) সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে আদেশ কি বারবার আদায়ের দাবি রাখে নাকি একবার? এবং নিষেধ কি সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী? এ বিষয়গুলো নিয়ে ইমামগণের মধ্যকার মতভেদ ফিকহী বিধান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. 'আমর' ও 'নাহী'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ):

- **(ক) আমর (الْأَمْرُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** আদেশ করা, নির্দেশ দেওয়া।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ: اِفْعَلْ."

(বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি 'করো' বা কোনো কাজ করার নির্দেশসূচক বাক্য বলাকে আমর বলে।)

শর্ত হলো এতে 'ইস্তিলা' বা বড়ত্ব প্রকাশ পেতে হবে।

- **(খ) নাহী (النَّهْيُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** নিষেধ করা, বারণ করা বা বাধা দেওয়া।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِمَنْ دُونَهُ: لَا تَفْعَلْ."

(বড়র পক্ষ থেকে ছোটর প্রতি 'করো না' বা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়াকে নাহী বলে।)

২. আমর ও নাহীর রূপসমূহ (صِيَغُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ):

- আমরের সিগাহ:

আরবি ভাষায় আমরের জন্য নির্দিষ্ট কিছু গঠন বা সিগাহ রয়েছে:

১. ফেলে আমর (فِعْلُ الْأَمْرِ): সরাসরি আদেশসূচক ক্রিয়া। যেমন—"أَقِيمُوا" (কায়েম কর), "آتُوا" (দাও)।

২. লামে আমর (لَامُ الْأَمْرِ): মুজারে বা বর্তমান কালের ক্রিয়ার শুরুতে আদেশসূচক 'লাম' যুক্ত করা। যেমন—"لِيُنْفِقْ" (সে যেন খরচ করে)।

- নাহীর সিগাহ:

নাহীর জন্য প্রধানত একটিই গঠন ব্যবহৃত হয়:

১. লা-এ নাহী (لَا النَّاهِيَةُ): মুজারে ক্রিয়ার শুরুতে নিষেধসূচক 'লা' যুক্ত করা। যেমন—"لَا تَقْرَبُوا" (কাছে যেও না), "لَا تُشْرِكْ" (শরীক করো না)।

৩. আমর ও নাহীর মোজিব বা হুকুম এবং মতভেদ (مُوجِبُهُمَا وَالْاِخْتِلَافُ فِيهِ):

- (ক) আমরের মোজিব (مُوجِبُ الْأَمْرِ):

আমরের দাবি বা হুকুম নিয়ে উসুলবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে—এটি কি 'তাকরার' (বারবার করা) ওয়াজিব করে, নাকি 'মাররাহ' (একবার করা)?

  - হানাফি মাজহাব ও ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মত:

আমরের সিগাহ নিজে থেকে 'তাকরার' (বারবার করা) বোঝায় না, আবার 'মাররাহ' (একবার)-এর জন্যও সীমাবদ্ধ নয়। তবে আদায়ের জন্য অন্তত একবার করা অপরিহার্য। তাই আমরের হুকুম হলো—জীবনের যেকোনো সময়ে অন্তত একবার আদায় করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, যদি না বারবার করার কোনো দলিল থাকে।

    - **দলিল:** হজ্জের আয়াত **"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ"** (হজ্জ পূর্ণ কর)। এই আদেশের কারণে জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। বারবার নয়।

  - অন্যান্যদের মত (কিছু শাফেয়ী ও মুতাজিলা):

তাদের কেউ কেউ বলেন, আমর সব সময় 'তাকরার' বা বারবার করার দাবি রাখে। অর্থাৎ সুযোগ পেলেই কাজটি করতে হবে।

- (খ) নাহীর মোজিব (مُوجِبُ النَّهْيِ):

নাহী বা নিষেধের হুকুম নিয়ে ইমামদের মধ্যে তেমন দ্বিমত নেই, তবে এর স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা আছে।

  - সর্বসম্মত মত:

নাহী বা নিষেধ সব সময়ের জন্য 'তাকরার' বা স্থায়িত্বের দাবি রাখে। অর্থাৎ, কোনো কাজ নিষেধ করলে তা সারা জীবনের জন্য বর্জন করা ওয়াজিব। একবার বর্জন করলে দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং সব সময় বিরত থাকতে হয়।

"النَّهْيُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ وَالتَّكْرَارَ." (নিষেধ সর্বদা এবং বারবার বর্জনের দাবি রাখে।)

- **পার্থক্য:** আমর পালন করতে হয় (ইতিবাচক), যা একবার করলেই অস্তিত্বে আসে। কিন্তু নাহী হলো বর্জন করা (নেতিবাচক), যা সর্বদা বজায় না রাখলে বর্জন প্রমাণিত হয় না।

  - **দলিল:** আল্লাহ বলেছেন, **"وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى"** (জিনার কাছেও যেও না)। এই নিষেধের অর্থ হলো, জীবনের কোনো মুহূর্তেই জিনা করা যাবে না। একবার বিরত থেকে পরে করলে হুকুম মানা হলো না।

৪. আমরের ক্ষেত্রে 'ফাওর' ও 'তরাখি' (তৎক্ষণাৎ বনাম বিলম্ব):

হানাফি মতে, আমরের সিগাহ শুধু কাজ তলব করে, সময় নির্দিষ্ট করে না। তাই আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে (ফাওর) আদায় করা ওয়াজিব নয়, বরং হায়াতের শেষ সময়ের আগে (তরাখি) আদায় করলেও আদায় হবে। তবে 'তাকরার' বা বারবার করার জন্য আলাদা দলিলের (সবব) প্রয়োজন হয়। যেমন—সূর্য ঢলে পড়লে জোহরের নামাজ বারবার ওয়াজিব হয়, কারণ এখানে 'সূর্য ঢলে পড়া' হলো সবব বা কারণ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আমর' ও 'নাহী' শরিয়তের দুটি প্রধান চালিকাশক্তি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আমরের ক্ষেত্রে মৌলিক দাবি হলো 'একবার আদায় করা' (যদি না অন্য দলিল থাকে), আর নাহীর ক্ষেত্রে মৌলিক দাবি হলো 'চিরস্থায়ীভাবে বর্জন করা'। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই হজ্জ জীবনে একবার ফরজ, কিন্তু জিনা ও মদ্যপান সর্বদা হারাম।

প্রশ্ন-২০: 'বায়ান'- এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। তারপর প্রয়োজনের সময় থেকে 'বায়ান'কে বিলম্বিত করা সম্পর্কে তুমি যা জান, তা লেখো।
عرف البيان واذكر أقسامه - ثم اكتب ما تعرف عن تأخير البيان عن وقت الحاجة

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'আল-বায়ান' (الْبَيَانُ)। শরিয়তের অনেক শব্দ বা বাক্য এমন থাকে যা অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত। এই অস্পষ্টতা দূর করে বা সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বক্তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করাকে বায়ান বলা হয়। আল্লাহর কালাম ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য বায়ান-এর প্রকারভেদ এবং এর বিধান জানা একজন মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-

বাজদাবি (রহ.) হানাফি উসুলের আলোকে বায়ানের যে বিস্তারিত বিভাজন দেখিয়েছেন, তা ফিকহ শাস্ত্রের এক অমূল্য সম্পদ।

১. 'বায়ান'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْبَيَانِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'বায়ান' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো—প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, ব্যাখ্যা করা বা উন্মোচন করা। এটি 'ইখফা' (গোপন করা)-এর বিপরীত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ إِظْهَارُ الْمُرَادِ وَإِيضَاحُهُ لِلسَّامِعِ."

(শ্রোতার নিকট বক্তার উদ্দেশ্য বা মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাকে বায়ান বলা হয়।)

অর্থাৎ, অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত কথার পর্দা সরিয়ে তার প্রকৃত অর্থ বের করে আনা।

২. বায়ানের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْبَيَانِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) এবং হানাফি উসুলবিদগণ বায়ানকে প্রধানত ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. বায়ানুত তাকরীর (بَيَانُ التَّقْرِيرِ):

কথার অর্থকে মজবুত ও নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

- *উদাহরণ:* আল্লাহ বললেন, **"এবং কথা বললেন আল্লাহ মুসার সাথে—কথপোকথনের মাধ্যমে"** (তাকলিমান)। এখানে 'তাকলিমান' শব্দটি ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এটি রূপক নয়, বরং বাস্তবিক কথা ছিল।

২. বায়ানুত তাফসির (بَيَانُ التَّفْسِيرِ):

যে শব্দের অর্থ অস্পষ্ট (মুজমাল বা মুশকিল), তার ব্যাখ্যা দেওয়া।

- *উদাহরণ:* কুরআনে বলা হয়েছে **"আকিমিস সালাহ"** (নামাজ কায়েম কর)। সালাত কী, তা অস্পষ্ট ছিল। রাসূল (সা.) তাঁর কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন সালাত কীভাবে পড়তে হয়। এটি বায়ানুত তাফসির।

৩. বায়ানুত তাগয়ীর (بَيَانُ التَّغْيِيرِ):

কথার বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন করা বা নির্দিষ্ট করা। যেমন—আম শব্দকে খাস করা (তাখসীস) বা শর্ত যুক্ত করা।

- *উদাহরণ:* **"তোমাদের ওপর তোমাদের মাতাদের হারাম করা হয়েছে"**—এটি আম বা ব্যাপক। অন্য জায়গায় দুধ-মাতাদের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে যা এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা শর্ত যুক্ত করা, যেমন—"ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক, **যদি** হাতে টাকা থাকে।"

৪. বায়ানুদ দারুরাহ (بَيَانُ الضَّرُورَةِ):

মুখের কথা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে (যেমন ইশারা বা নীরবতা) ব্যাখ্যা দেওয়া।

- *উদাহরণ:* রাসূল (সা.)-কে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি চুপ রইলেন। এই **সুকুত** বা নীরবতা সম্মতির লক্ষণ হিসেবে বায়ান।

৫. বায়ানুত তাবদিল (بَيَانُ التَّبْدِيلِ):

পূর্বের বিধানকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা রহিত (নাসখ) করে নতুন বিধান দেওয়া। একে বায়ানুন নাসখও বলা হয়।

৩. প্রয়োজনের সময় থেকে বায়ানকে বিলম্বিত করা (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ):

বায়ান কখন পেশ করতে হবে, তা নিয়ে উসুলবিদদের মধ্যে একটি বিখ্যাত মতভেদ বা মাসআলা রয়েছে। একে 'তাখিরুল বায়ান' (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ) বলা হয়।

- (ক) خطاب (খিতাব) বা সম্বোধনের সময় থেকে বিলম্ব করা:

অর্থাৎ আল্লাহ কোনো হুকুম দিলেন এখন, কিন্তু তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন কিছুদিন পর—এটা কি জায়েজ?

- **হুকুম:** হ্যাঁ, এটি সর্বসম্মতিক্রমে **জায়েজ**।
- *উদাহরণ:* আল্লাহ বললেন "হজ্জ কর", কিন্তু হজ্জের নিয়মকানুন হজ্জের মাস আসার আগে বা পরে বিস্তারিত জানালেন। এটি জায়েজ, কারণ আমল করার সময় তো এখনো আসেনি।

- (খ) حاجة (হাজত) বা প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্ব করা:

অর্থাৎ যে সময়ে আমল করা ওয়াজিব, সেই সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ব্যাখ্যা দেওয়া—এটা কি জায়েজ?

- **হুকুম:** হানাফি ও অধিকাংশ উসুলবিদের মতে, **"এটি জায়েজ নয়" (لَا يَجُوزُ)**।
- **যুক্তি:** কারণ, বান্দার ওপর এমন হুকুম পালন করা ওয়াজিব করা যা সে জানে না বা বুঝতেই পারেনি—এটা অসম্ভব বা 'তাকলিফ মা লা ইউতাক'। আমল করার সময় চলে যাওয়ার পর নিয়ম বলে দিলে তো আর আমল করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ: নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু বান্দাকে জানানোই হলো না যে কীভাবে নামাজ পড়তে হবে। পরে সময় শেষ হলে বলা হলো "তুমি নামাজ পড়নি কেন?"—এমনটি আল্লাহর হেকমতের পরিপন্থী। তাই প্রয়োজনের সময় (ওয়াক্তে হাজত) বায়ান অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বায়ান হলো শরিয়তের বিধান স্পষ্ট করার মাধ্যম। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, বায়ানুত তাগয়ীর ও তাবদিল কেবল ওহীর যুগেই সম্ভব ছিল, কিন্তু বায়ানুত তাফসির কিয়ামত পর্যন্ত মুজতাহিদদের ইজতিহাদের মাধ্যমে চলতে থাকবে। তবে মূলনীতি হলো—মানুষকে আমল করার সুযোগ ও জ্ঞান দেওয়ার পরই আল্লাহ তাদের হিসাব নেবেন, তার আগে নয়।

প্রশ্ন-২১: 'আম' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিধান কী? যদি তাতে 'খুসূস' (নির্দিষ্টকরণ) আসে, তবে কি তা হুজ্জত (দলিল) হিসেবে বাকি থাকে? এ বিষয়ে আলেমদের মতপার্থক্য উল্লেখ কর।

ما معنى العام لغة واصطلاحا؟ وما حكمه؟ هل يبقى حجة اذا لحقه خصوص؟ اذكر اختلاف العلماء فيه

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনের বিধানগুলো কখনো 'খাস' (নির্দিষ্ট) আবার কখনো 'আম' (ব্যাপক) শব্দের মাধ্যমে এসেছে। 'আম' শব্দের বিধান এবং যখন এর কিছু অংশকে 'তাখসীস' বা নির্দিষ্ট করে বের করে দেওয়া হয়, তখন অবশিষ্ট অংশের ওপর আমল করা জরুরি কি না—এ নিয়ে উসুলবিদদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্ক ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিপক্ষ দলের মতভেদ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

১. 'আম'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْعَامِّ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'আম' (الْعَامُّ) শব্দটি আরবি 'উমুম' (عُمُومٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—ব্যাপক, শামিলকারী, বা যা অনেককে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন বলা হয়—'মাতরুন আম' (ব্যাপক বৃষ্টি), যা সব এলাকাকে শামিল করে।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيُّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"الْعَامُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى."

(আম হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা শাব্দিক বা অর্থগতভাবে বহুসংখ্যক নামকৃত বস্তুকে বা একদল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।)

সহজ কথায়, যে শব্দ তার অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনির্দিষ্টভাবে বহু একককে শামিল করে নেয়, তাকে আম বলে। যেমন—'ইনসান' (মানুষ)।

২. 'আম'-এর বিধান (حُكْمُ الْعَامِّ):

আম শব্দের বিধান হলো, এটি তার অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের ওপর ব্যাপকভাবেই প্রযোজ্য হবে।

- **'আম মাহফুজ' (সংরক্ষিত আম):** যদি আম শব্দ থেকে কাউকে বের করা না হয়, তবে হানাফি মতে এটি **'কাতয়ী'** (অকাট্য) দলিল হিসেবে গণ্য হবে। এর ওপর আমল করা ফরজ।

- **'আম মাখসুস' (নির্দিষ্টকৃত আম):** যদি আম থেকে কিছু অংশ বের করে দেওয়া হয়, তবে অবশিষ্ট অংশের ওপর আমল করা ওয়াজিব, কিন্তু তখন এটি আর অকাট্য থাকে না, বরং **'জন্নি'** (ধারণামূলক) হয়ে যায়।

৩. তাখসীসের পর কি আম 'হুজ্জত' থাকে? (هَلْ يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ؟):

প্রশ্ন হলো: একটি আম শব্দ (যেমন—'মুশরিকদের হত্যা কর') থেকে যখন কিছু লোক (যেমন—চুক্তিবদ্ধ কাফের) বের করে দেওয়া হয়, তখন বাকি মুশরিকদের ব্যাপারে কি ওই আয়াতটি দলিল (হুজ্জত) হিসেবে বহাল থাকবে?

এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে তিনটি প্রধান মত পাওয়া যায়:

- প্রথম মত: হানাফি উসুলবিদ ও জমহুরের অভিমত (প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম বাজদাবি (রহ.) এবং অধিকাংশ ফকিহের মতে:

"يَبْقَى حُجَّةً فِي الْبَاقِي لَكِنْ ظَنًّا لَا قَطْعًا."

(তাখসীস হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে আম শব্দটি 'হুজ্জত' বা দলিল হিসেবে বাকি থাকে, তবে তা 'জন্নি' বা প্রবল ধারণা হিসেবে গণ্য হয়, অকাট্য হিসেবে নয়।)

যুক্তি: আম শব্দটি মূলত গঠিত হয়েছে সবাইকে বোঝানোর জন্য। কিছু লোককে বের করে দিলেও বাকিদের বোঝানোর যোগ্যতা শব্দটির মধ্যে রয়ে গেছে। তাই বাকিদের ওপর হুকুম প্রয়োগ করতে হবে। তবে যেহেতু একবার কাটছাঁট (তাখসীস) করা হয়েছে, তাই এর শক্তিমত্তা কিছুটা কমে অকাট্য থেকে জন্নির স্তরে নেমে আসে।

- দ্বিতীয় মত: ঈসা ইবনে আবান (রহ.)-এর অভিমত:

হানাফি ফকিহ ঈসা ইবনে আবান (রহ.) একটি মধ্যবর্তী মত দিয়েছেন। তিনি বলেন:

  - যদি তাখসীসটি **'মাজহুল'** (অজ্ঞাত) হয় (অর্থাৎ ঠিক কাদের বের করা হলো তা স্পষ্ট না থাকে), তবে অবশিষ্ট আম আর হুজ্জত থাকে না।
  - আর যদি তাখসীসটি **'মালুম'** (জানা) হয় (অর্থাৎ কাদের বের করা হলো তা স্পষ্ট), তবে বাকিদের জন্য আম শব্দটি হুজ্জত হিসেবে বহাল থাকবে।

- তৃতীয় মত: মুতazila ও কিছু শাফেয়ীর অভিমত:

কিছু মুতাজিলা এবং আবুল হাসান কারখী (রহ.)-এর মতে:

"سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مُطْلَقًا."

(তাখসীস হওয়ার পর আম শব্দটি দ্বারা দলিল দেওয়া বা হুজ্জত পেশ করা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়।)

তাদের যুক্তি: 'আম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল সবাইকে বোঝানোর জন্য। যখন তাখসীস করে কিছু লোককে বের করে দেওয়া হলো, তখন শব্দটি তার আসল অর্থ (সবাই) থেকে সরে গেল এবং এটি 'মাজাজ' (রূপক) হয়ে গেল। আর রূপক শব্দের সীমানা নির্দিষ্ট নেই, তাই এটি আর দলিল হতে পারে না যতক্ষণ না নতুন দলিল পাওয়া যায়।

৪. মতপার্থক্যের ফলাফল:

হানাফিদের মতে, যেহেতু 'আম মাখসুস' (নির্দিষ্টকৃত আম) হুজ্জত বা দলিল হিসেবে বাকি থাকে, তাই এর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যায় এবং এর ওপর কিয়াস করা চলে। কিন্তু বিরোধীদের মতে, এটি যেহেতু হুজ্জত থাকে না, তাই তারা এর ওপর আমল করতে চায় না যতক্ষণ না অন্য দলিল পাওয়া যায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আম শব্দে তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণ আসার পরেও তা বাতিল হয়ে যায় না। বরং বাকি সদস্যদের ওপর তা দলিল হিসেবে কার্যকর থাকে। তবে সতর্কতার খাতিরে এর মান 'কাতয়ী' থেকে 'জন্নি' স্তরে নামিয়ে আনা হয়। এটি হানাফি ফিকহের একটি উদার ও বাস্তবসম্মত নীতি।

প্রশ্ন-২২: 'দালালত' (নির্দেশনাসমূহ)-এর সংজ্ঞা দাও। তারপর দালালতের প্রকারগুলো বিস্তারিতভাবে লেখ।

عرف الدلالات - ثم اكتب أقسام الدلالات بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর শব্দাবলী থেকে শরিয়তের বিধান (আহকাম) বের করা। মুজতাহিদ বা ফকিহগণ শব্দ থেকে অর্থ বের করার জন্য গভীর মনোযোগ দেন। এই অর্থ বের করার পদ্ধতি বা নির্দেশনাকেই উসুলের পরিভাষায় 'দালালত' (الدَّلَالَاتُ) বলা হয়। হানাফি মাজহাবের ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শব্দের অর্থ নির্গত করার পদ্ধতিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো জানা ছাড়া সঠিক ফতোয়া দেওয়া বা শরিয়তের হুকুম বোঝা অসম্ভব। নিম্নে দালালতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. দালালত-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الدَّلَالَاتِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'দালালত' (دَلَالَةٌ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—পথ দেখানো, নির্দেশ করা বা গাইড করা। যে বস্তু অন্য বস্তুর খোঁজ দেয়, তাকে 'দালিল' বা 'দাল' বলা হয়।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদদের পরিভাষায় দালালত হলো:

"كَيْفِيَّةُ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى."

(শব্দ তার অর্থের ওপর কীভাবে নির্দেশনা প্রদান করে, তার পদ্ধতি বা ধরণকে দালালত বলে।)

অর্থাৎ, একটি আয়াত বা হাদিসের শব্দ থেকে হুকুমটি কি সরাসরি বোঝা যাচ্ছে, নাকি ইশারা-ঙ্গিতে, নাকি যুক্তির মাধ্যমে—তা নির্ণয় করাই হলো দালালত।

২. দালালতের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الدَّلَالَاتِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদগণ অর্থ নির্গত হওয়ার পদ্ধতির (Wujuh al-wuquf ala al-ma'na) ভিত্তিতে দালালতকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

- (ক) ইবারাতুন নস (عِبَارَةُ النَّصِّ) - শাব্দিক বা বাচনিক নির্দেশনা:

এটি দালালতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকার।

  - **সংজ্ঞা:** যখন কোনো বাক্যের শব্দাবলী থেকে সেই অর্থটিই সরাসরি বোঝা যায়, যেই অর্থের জন্য বাক্যটি বলা হয়েছে বা সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ বক্তার মূল উদ্দেশ্য বা প্রত্যক্ষ অর্থ।

  - **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন, **"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"** (আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন)।

    - *বিশ্লেষণ:* এই আয়াতের 'ইবারাত' বা শব্দ থেকেই সরাসরি বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম। এটিই আয়াতের ইবারাতুন নস।

- **(খ) ইশারাতুন নস (إِشَارَةُ النَّصِّ) - ইঙ্গিতবহ নির্দেশনা:**

  - **সংজ্ঞা:** যখন বাক্যের শব্দাবলী থেকে এমন কোনো অর্থ সরাসরি বলা হয়নি, কিন্তু বাক্যের গঠন বা প্রসঙ্গ থেকে সেই অর্থটি ইশারা-ঙ্গিতে বোঝা যায়। এটি শব্দের মূল উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু শব্দের অপরিহার্য ফলাফল।

  - **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন, **"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ"** (আর সন্তানের পিতার ওপর মায়েদের ভরণপোষণের দায়িত্ব)।

    - *বিশ্লেষণ:* এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মায়ের খরচ দেওয়া (এটি ইবারাত)। কিন্তু **"মাউলুদি লাহু"** (যার জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া হয়েছে) শব্দটি ইশারা করছে যে, সন্তানের বংশ পরিচয় বা নসব পিতার দিকেই যাবে। এটি হলো ইশারাতুন নস।

- (গ) দালালাতুন নস (دَلَالَةُ النَّصِّ) - যৌক্তিক বা মর্মগত নির্দেশনা:

একে 'মাফহুমে মুওয়াফাকা'ও বলা হয়।

- **সংজ্ঞা:** যখন কোনো হুকুমের 'ইল্লত' বা কারণটি কেবল ভাষা জ্ঞান দিয়েই বোঝা যায় (ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় না) এবং সেই কারণের ভিত্তিতে অন্য বিষয়েও হুকুমটি সাব্যস্ত হয়।

- **উদাহরণ:** আল্লাহ পিতা-মাতার ব্যাপারে বলেছেন, **"ফাল, তাকুল লাহুমা উফ"** (তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না)।

  - *বিশ্লেষণ:* 'উফ' বলা নিষেধ কেন? কারণ এতে তারা কষ্ট পায়। এই কারণটি বুঝে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বোঝে যে, পিতা-মাতাকে 'মারা' বা 'গালি দেওয়া' আরও জঘন্য অপরাধ। 'উফ' বলার নিষেধ থেকে 'মারা' নিষেধ হওয়াটা হলো দালালাতুন নস।

- **(ঘ) ইকতিজাউন নস (اِقْتِضَاءُ النَّصِّ) - চাহিদাগত বা উহ্য নির্দেশনা:**

  - **সংজ্ঞা:** যখন কোনো বাক্যের অর্থ ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বা আমলযোগ্য হয় না, যতক্ষণ না সেখানে কোনো উহ্য শব্দ (Mahzuf) মেনে নেওয়া হয়। বাক্যটি সত্য হওয়ার জন্য এই উহ্য শব্দটি জরুরি।

  - **উদাহরণ ১:** হাদিসে এসেছে, **"রুফিয়া আন উম্মাতি... ওয়ামাস তুকরিহু আলাইহি"** (আমার উম্মত থেকে জোর জবরদস্তির বিষয় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে)।

    - *বিশ্লেষণ:* বাস্তবে জবরদস্তি বা ভুল তো ঘটছেই, উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। তাই বাক্যটি সত্য হতে হলে এখানে একটি শব্দ উহ্য মানতে হবে: **"ইসমু"** (পাপ) বা **"হুকুমু"** (বিধান)। অর্থাৎ, ভুলের **পাপ** উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই 'পাপ' শব্দটি মেনে নেওয়াই হলো ইকতিজাউন নস।

  - **উদাহরণ ২:** কেউ বলল, **"তোমার এই গোলামটি আমার পক্ষ থেকে স্বাধীন করে দাও ১০০০ টাকায়"**।

    - *বিশ্লেষণ:* অন্যের গোলাম কেউ স্বাধীন করতে পারে না। তাই এখানে ইকতিজা হলো: "প্রথমে তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর, তারপর আমার হয়ে স্বাধীন কর।"

৩. শক্তি ও অগ্রাধিকারের ক্রম (تَرْتِيبُهَا فِي الْقُوَّةِ):

যদি এই প্রকারগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে শক্তিশালীকে দুর্বলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। ক্রমটি নিম্নরূপ:

১. ইবারাতুন নস (সবচেয়ে শক্তিশালী)।

২. ইশারাতুন নস।

৩. দালালাতুন নস।

৪. ইকতিজাউন নস (সবচেয়ে দুর্বল)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, শরিয়তের দলিল থেকে মাসআলা বের করার জন্য 'দালালত' বা নির্দেশনার এই চারটি প্রকার হলো মুজতাহিদের প্রধান হাতিয়ার। হানাফি ফিকহের বিশাল ভাণ্ডার মূলত এই সূক্ষ্ম উসুলি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ইবারাত দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা ইশারা বা দালালতের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

প্রশ্ন-২৩: 'আম' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কয়টি প্রকার রয়েছে? তারপর 'উমুমের শব্দগুলো' (আলফাজুল উমুম) বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।

ما معنى العام لغةً واصطلاحا؟ وكم نوعا له؟ ثم بين الفاظ العموم مفصلا

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'আম' বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের আলোচনা। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিধানগুলো সঠিকভবে অনুধাবন করার জন্য কোন শব্দটি 'খাস' (নির্দিষ্ট) আর কোনটি 'আম' (ব্যাপক), তা চেনা অপরিহার্য। কারণ, শব্দের ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করেই শরিয়তের হুকুম হাজারো মানুষের ওপর প্রযোজ্য হয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) আম শব্দের সংজ্ঞা, প্রকার এবং এর নির্দিষ্ট শব্দাবলী (সিগাহ) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. 'আম'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعَامِّ):

- আভিধানিক অর্থ (الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ):

'আম' (الْعَامُّ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—ব্যাপক, অন্তর্ভুক্তকারী, বা যা অনেককে শামিল করে। যেমন বলা হয়—'খাইরুন আম' (ব্যাপক কল্যাণ) বা 'মাতরুন আম' (ব্যাপক বৃষ্টি)। এটি 'খাস'-এর বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা (الْمَعْنَى الْاِصْطِلَاحِيُّ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"الْعَامُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى."

(আম হলো এমন প্রতিটি শব্দ, যা শাব্দিক বা অর্থগতভাবে বহুসংখ্যক নামকৃত বস্তুকে বা একদল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।)

সহজ কথায়, যে শব্দ তার অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনির্দিষ্টভাবে বহু একককে শামিল করে নেয়।

২. 'আম'-এর প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْعَامِّ):

ব্যবহারের দিক থেকে আম প্রধানত তিন প্রকার:

১. **আম মাহফুজ (الْعَامُّ الْمَحْفُوظُ):** যে আম শব্দের মধ্যে কোনো তাখসীস বা কাটছাঁট করা হয়নি। এর হুকুম অকাট্য (কাতয়ী)।
২. **আম মাখসুস (الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ):** যে আম শব্দ থেকে দলিলের মাধ্যমে কিছু সদস্যকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এর হুকুম জন্নি (ধারণামূলক)।
৩. **আম উরিদা বিহিল খুসুস (الْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ):** শব্দটি আম, কিন্তু শুরু থেকেই বক্তার উদ্দেশ্য খাস।

৩. উমুমের শব্দগুলো বা 'আলফাজুল উমুম' (أَلْفَاظُ الْعُمُومِ):

আরবি ভাষায় এমন কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বা গঠন (Form) রয়েছে, যা দেখলেই বোঝা যায় যে এখানে ব্যাপক অর্থ বা 'উমুম' উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। ইমাম বাজদাবি (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদগণ এগুলোকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রধান কয়েকটি 'আলফাজুল উমুম' নিচে আলোচনা করা হলো:

- (ক) আলিফ-লাম যুক্ত বহুবচন (الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ):

যখন কোনো বহুবচন শব্দের শুরুতে 'আলিফ-লাম' (ال) বা 'লামে ইস্তিগরাক' যুক্ত হয়, তখন তা আম বা ব্যাপক অর্থ দেয়।

  - *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন, **"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ"** (মুমিনগণ সফল হয়েছে)। এখানে 'আল-মুমিনুন' শব্দটি আম। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত।

- (খ) 'মান' বা 'যিনি/যারা' (كَلِمَةُ "مَنْ" لِمَنْ يَعْقِلُ):

'মান' (مَنْ) শব্দটি বিবেকবান সত্তা বা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন—সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন, **"وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا..."** (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে...)। এখানে 'মান' শব্দটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত যেকোনো হত্যাকারীকে শামিল করে।

- (গ) 'মা' বা 'যা/যা কিছু' (كَلِمَةُ "مَا" لِمَا لَا يَعْقِلُ):

'মা' (مَا) শব্দটি সাধারণত বিবেকহীন বস্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ দেয়।

- *উদাহরণ:* আল্লাহ বলেন, **"وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"** (আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সব আল্লাহর)। এখানে 'মা' শব্দটি প্রতিটি অণু-পরমাণুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

- (ঘ) নেতিবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট শব্দ (النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ):

যখন কোনো 'নাকিরা' (অনির্দিষ্ট) শব্দ নেতিবাচক (না-বোধক) বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা চূড়ান্ত ব্যাপকতা বা 'উমুমে ইস্তিগরাকি' বোঝায়।

- *উদাহরণ:* **"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"** (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। এখানে 'ইলাহ' শব্দটি নাকিরা এবং 'লা' (নেই) দ্বারা নেতিবাচক বাক্যে এসেছে। তাই এর অর্থ— কোনো প্রকার ইলাহ বা মাবুদ নেই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

- (ঙ) আলিফ-লাম যুক্ত একবচন (الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ):

একবচন শব্দের শুরুতে যদি জাতিবাচক 'আলিফ-লাম' (লামে জিন্স) আসে, তবে তাও আম অর্থ দেয়।

- *উদাহরণ:* **"إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"** (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে)। এখানে 'আল-ইনসান' একবচন হলেও এর অর্থ 'সকল মানুষ'।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আলফাজুল উমুম' বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দগুলো চেনা মুজতাহিদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কারণ, কুরআনের একটি শব্দের শুরুতে 'আলিফ-লাম' থাকা বা না থাকার কারণে পুরো বিধান বদলে যেতে পারে। ইমাম বাজদাবি (রহ.) এই শব্দগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর কোন হুকুমটি সবার জন্য, আর কোনটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। এই শব্দগুলোর মাধ্যমেই শরিয়তের বিধানের বিশ্বজনীনতা বা ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-২৪: উমুমের শব্দগুলো কয়টি এবং কী কী? তারপর সংক্ষেপে উমুমের বিধানগুলো ব্যাখ্যা কর।

الفاظ العموم كم هي وما هي؟ ثم بين احكام العموم مختصرا

উত্তর:

ভূমিকা:

উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'আম' বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের আলোচনা। শরিয়তের বিধানাবলী সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার ভিত্তি হলো এই 'উমুম'। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) তাঁর কিতাবে আম শব্দের নির্দিষ্ট গঠন (সিগাহ) এবং এর বিধান (হুকুম) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী আম শব্দের বিধান অন্যান্য মাজহাব থেকে কিছুটা ভিন্ন ও স্বকীয়। নিম্নে উমুমের শব্দগুলো এবং এর বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. উমুমের শব্দগুলো (أَلْفَاظُ الْعُمُومِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, আম বা ব্যাপক অর্থ বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা গঠন (Form) রয়েছে। এগুলো প্রধানত ৫টি। যথা:

- (ক) আলিফ-লাম যুক্ত বহুবচন (الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ):

যখন কোনো বহুবচন শব্দের শুরুতে 'আলিফ-লাম' (ال - লামে ইস্তিগরাক) যুক্ত হয়।

  - *উদাহরণ:* **"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"** (নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন)। এখানে 'আল-মুহসিনিন' শব্দটি আম, যা সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

- (খ) আলিফ-লাম যুক্ত একবচন (الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ):

যখন জাতিবাচক বা 'জিনস' বোঝানোর জন্য একবচনের শুরুতে আলিফ-লাম আসে।

  - *উদাহরণ:* **"إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"** (নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে)। এখানে 'আল-ইনসান' একবচন হলেও অর্থ হলো 'সকল মানুষ'।

- **(গ) বিশেষ কিছু ইসম বা বিশেষ্য (الْأَسْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ):**

  - **'মান' (مَنْ):** এটি বিবেকবান সত্তা (যেমন মানুষ)-এর জন্য ব্যাপক অর্থ দেয়। যেমন—**"ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা..."** (তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই মাসটি পাবে...)।

- **'মা' (مَا):** এটি বিবেকহীন বস্তু বা প্রাণীর জন্য ব্যাপক অর্থ দেয়। যেমন—**"মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু"** (তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে যাবে)।

- (ঘ) নেতিবাচক বাক্যে অনির্দিষ্ট শব্দ (النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ):

যখন কোনো 'নাকিরা' (অনির্দিষ্ট) শব্দ না-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

- *উদাহরণ:* **"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"** (কোনো ক্ষতি করা নেই এবং ক্ষতি সওয়াও নেই)। এখানে 'ক্ষতি' শব্দটি সব ধরনের ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

- (ঙ) শর্তবাচক শব্দসমূহ (أَسْمَاءُ الشَّرْطِ):

যে শব্দগুলো শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোও উমুমের অর্থ দেয়। যেমন—'আইয়ু' (أَيُّ - যেকোনো), 'আইনা' (أَيْنَ - যেখানেই)।

২. উমুমের বিধান বা হুকুম (أَحْكَامُ الْعُمُومِ):

হানাফি উসুল অনুযায়ী আম শব্দের বিধান অত্যন্ত শক্তিশালী। সংক্ষেপে এর বিধানগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- (ক) অকাট্য দলিল হওয়া (قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ):

হানাফি মতে, আম শব্দ যতক্ষণ পর্যন্ত 'মাহফুজ' থাকে (অর্থাৎ তাতে কোনো তাখসীস বা কাটছাঁট করা না হয়), ততক্ষণ তা 'কাতয়ী' বা অকাট্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়।

- *তাৎপর্য:* এর বিপরীতে কোনো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক হাদিস) বা 'কিয়াস' গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি কুরআনের কোনো আম আয়াতের সাথে একক হাদিসের সংঘর্ষ হয়, তবে আম আয়াতই প্রাধান্য পাবে। (শাফেয়ী মতে আম শব্দটি 'জন্নি' বা ধারণামূলক)।

- (খ) সকলের ওপর বিধান প্রযোজ্য হওয়া (شُمُولُ الْأَفْرَادِ):

আম শব্দ তার অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের ওপর সমানভাবে বিধান সাব্যস্ত করে। কাউকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই, যতক্ষণ না দলিল পাওয়া যায়।

- (গ) তাখসীসের পর জন্নি হওয়া (الظَّنِّيَّةُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ):

যদি অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আম শব্দ থেকে কিছু অংশ বের করে দেওয়া হয় (তাখসীস), তবে অবশিষ্ট অংশের ওপর আমল করা ওয়াজিব থাকে ঠিকই, কিন্তু তখন তা আর 'কাতয়ী'

থাকে না, বরং 'জন্নি' (প্রবল ধারণা) হয়ে যায়। তখন তার বিপরীতে খবরে ওয়াহিদ বা কিয়াস গ্রহণ করা যেতে পারে।

- (ঘ) আমল করা ওয়াজিব:

সর্বাবস্থায় আম শব্দের দাবির ওপর আমল করা ওয়াজিব। মুজতাহিদ তার গবেষণায় প্রথমে আম শব্দের ওপর আমল করার চেষ্টা করবেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'উমুম' বা ব্যাপকতা হলো ইসলামি আইনের এক বিশাল ভাণ্ডার। কুরআনের ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে যে অগণিত মানুষের জন্য বিধান সাব্যস্ত হয়েছে, তা মূলত এই আম শব্দেরই অলৌকিকতা। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, আম শব্দ মূলত অকাট্য, যা হানাফি ফিকহকে অন্যান্য মাজহাব থেকে স্বকীয়তা দান করেছে।

প্রশ্ন-২৫: 'মুত্বলাক' ও 'মুকাইয়্যদ'-এর সংজ্ঞা দাও। মুত্বলাক-কে কখন মুকাইয়্যদের ওপর প্রয়োগ (হামল) করা যায় এবং কখন যায় না? হানাফি ও শাফেয়ী মাজহাবের মতভেদসহ আলোচনা কর।

عرف المطلق والمقيد - متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا؟ بين مع اختلاف المذهبين الحنفي والشافعي

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের সীমানা নির্ধারণে 'মুত্বলাক' (المطلق) ও 'মুকাইয়্যদ' (المقيد) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা। পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো হুকুম শর্তহীনভাবে (মুত্বলাক) এসেছে, আবার কোনোটি শর্তযুক্তভাবে (মুকাইয়্যদ) এসেছে। এক জায়গার শর্তহীন হুকুমকে অন্য জায়গার শর্ত দিয়ে বেঁধে দেওয়া যাবে কি না—এটি উসূল শাস্ত্রের একটি জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনার বিষয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১. 'মুত্বলাক' ও 'মুকাইয়্যদ'-এর সংজ্ঞা (تَعْرِيفُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ):

- **(ক) মুত্বলাক (الْمُطْلَقُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** মুক্ত, স্বাধীন বা শর্তহীন।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ اللَّفْظُ الْخَاصُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ دُونَ الصِّفَةِ."

(মুত্বলাক হলো এমন খাস শব্দ, যা কোনো গুণ বা শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই কেবল সত্তা বা জাতকে বোঝায়।)

- *উদাহরণ:* **"رَقَبَةٍ"** (একজন দাস)। এখানে দাসটি মুমিন না কাফের, ছোট না বড়—কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি।

- **(খ) মুকাইয়্যদ (الْمُقَيَّدُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** আবদ্ধ, শিকলবন্দী বা শর্তযুক্ত।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ مَعَ الصِّفَةِ."

(মুকাইয়্যদ হলো এমন শব্দ, যা সত্তার সাথে সাথে কোনো অতিরিক্ত গুণ বা শর্তকেও বোঝায়।)

- *উদাহরণ:* **"رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ"** (একজন **মুমিন** দাস)। এখানে 'মুমিন' হওয়ার শর্ত বা কায়েদ যুক্ত করা হয়েছে।

২. মুত্বলাককে মুকাইয়্যদের ওপর প্রয়োগের বিধান (حُكْمُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ):

যদি একই বিষয়ে কুরআনের এক জায়গায় মুত্বলাক শব্দ এবং অন্য জায়গায় মুকাইয়্যদ শব্দ আসে, তবে মুত্বলাক শব্দটিকে মুকাইয়্যদের শর্ত দিয়ে নির্দিষ্ট করা হবে কি না? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- হানাফি মাজহাবের মত (ইমাম আবু হানিফা ও বাযদাবী রহ.):

হানাফিদের মূলনীতি হলো: "আল-মুত্বলাকু ইয়াজরি আলা ইতলাকিহি" (মুত্বলাক তার শর্তহীন অবস্থার ওপরই বহাল থাকবে)।

  - অর্থাৎ, এক জায়গার শর্ত বা গুণকে অন্য জায়গায় টেনে আনা যাবে না, যতক্ষণ না উভয় আয়াতের **'হুকুম'** (বিধান) এবং **'সাবাব'** (কারণ) একই হয়। যদি বিধান বা কারণ ভিন্ন হয়, তবে মুত্বলাক মুত্বলাকই থাকবে, আর মুকাইয়্যদ মুকাইয়্যদই থাকবে।

- শাফেয়ী মাজহাবের মত (ইমাম শাফেয়ী রহ.):

তাদের মূলনীতি হলো: "হামলুল মুত্বলাক আলাল মুকাইয়্যদ"।

- অর্থাৎ, যদি বিধান এক হয়, তবে মুত্বলাক শব্দটিকে মুকাইয়্যদের শর্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। তারা কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক আয়াতের শর্তকে অন্য আয়াতে প্রয়োগ করার পক্ষে।

৩. উদাহরণ ও প্রয়োগ (الْمِثَالُ وَالتَّطْبِيقُ):

- **মাসআলা: কাফফারায় দাস মুক্ত করা**

- **কুরআনের আয়াত-১ (যিহারের কাফফারা):** সূরা মুজাদালায় যিহারের কাফফারা সম্পর্কে বলা হয়েছে—**"তাহরিরু রাকাবাতিন"** (একজন দাস মুক্ত করা)। এখানে শব্দটি **'মুত্বলাক'** (মুমিন হওয়ার শর্ত নেই)।

- **কুরআনের আয়াত-২ (হত্যার কাফফারা):** সূরা নিসায় ভুলবশত হত্যার কাফফারা সম্পর্কে বলা হয়েছে—**"তাহরিরু রাকাবাতিন মুমিনাতিন"** (একজন **মুমিন** দাস মুক্ত করা)। এখানে শব্দটি **'মুকাইয়্যদ'** (মুমিন হওয়ার শর্ত আছে)।

হুকুমের পার্থক্য:

- **শাফেয়ী মত:** তাঁরা হত্যার কাফফারার 'ঈমান'-এর শর্তটিকে যিহারের কাফফারায়ও প্রয়োগ করেন। তাই তাঁদের মতে, যিহারের কাফফারায়ও দাসকে অবশ্যই 'মুমিন' হতে হবে।

- **হানাফি মত:** ইমাম বাজদাবি (রহ.) বলেন, এখানে দুটি ঘটনার **'সাবাব'** (কারণ) ভিন্ন। একটি হলো 'হত্যা', অন্যটি 'যিহার'। তাই একটার শর্ত অন্যটায় আনা যাবে না। কুরআনে যিহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ শর্ত দেননি, তাই হানাফি মতে যিহারের কাফফারায় কাফের দাস মুক্ত করলেও আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ যা সহজ রেখেছেন, তা কঠিন করা ঠিক নয়।

৪. কখন হানাফি মতেও মুত্বলাক মুকাইয়্যদ হয়?

যদি হুকুম এবং সাবাব উভয়টি এক হয়, কেবল তখনই হানাফিরা মুত্বলাককে মুকাইয়্যদ করেন।

- *উদাহরণ:* রোজার কাফফারার হাদিসে এক বর্ণনায় আছে "রোজা রাখ", অন্য বর্ণনায় আছে "ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখ"। এখানে ঘটনা ও বিধান একই হওয়ায় "ধারাবাহিকতা"র শর্তটি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'মুত্বলাক' ও 'মুকাইয়্যদ' শরিয়তের বিধান পালনের সীমানা নির্দেশ করে। হানাফি মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি হলো কুরআনের শব্দের নিজস্বতার ওপর অটল থাকা এবং অপ্রয়োজনে বিধানকে সংকীর্ণ না করা। অন্যদিকে শাফেয়ী মাজহাব কিয়াস বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিধানকে একত্রিত করার পক্ষে।

প্রশ্ন-২৬: 'হাকীকত' ও 'মাজায'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এদের হুকুম বা বিধান কী? হাকীকত ও মাজায কি একত্রে জমা হতে পারে? বিস্তারিত আলোচনা কর। عرف الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحا - وما حكمهما؟ وهل يجتمعان في لفظ واحد؟ بين مفصلا

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ (ইস্তেমাল) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শব্দকে শরিয়তে কোন অর্থে গ্রহণ করা হবে—আসল অর্থে নাকি রূপক অর্থে—তা নির্ধারণের ওপর ভিত্তি করেই হালাল-হারামের বিধান সাব্যস্ত হয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) শব্দের ব্যবহারের ভিত্তিতে শব্দকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১. হাকীকত (আসল) এবং ২. মাজায (রূপক)। নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. হাকীকত ও মাজায-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ):

- **(ক) হাকীকত (الْحَقِيقَةُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** স্থির, বাস্তব বা সত্য। এটি 'হাক্কুন' (حَقٌّ) শব্দ থেকে এসেছে।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"كُلُّ لَفْظٍ اُسْتُعْمِلَ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ."

(যে শব্দকে তার মূল বা আভিধানিক অর্থের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে হাকীকত বলে।)

  - **উদাহরণ: 'আসাদ'** (সিংহ) শব্দটি ব্যবহার করে বনের পশু বোঝানো। অথবা **'সালাত'** শব্দ দিয়ে শরিয়তের নির্দিষ্ট নামাজ বোঝানো।

- **(খ) মাজায (الْمَجَازُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** অতিক্রম করার স্থান বা রূপক।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"كُلُّ لَفْظٍ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ."

(যে শব্দকে কোনো সম্পর্ক (আলাকা) থাকার কারণে এবং মূল অর্থ গ্রহণে বাধা (কারিনা) থাকার কারণে মূল অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে মাজায বলে।)

- **উদাহরণ: 'আসাদ'** (সিংহ) শব্দটি ব্যবহার করে কোনো 'বীর পুরুষ' বা সাহসী ব্যক্তিকে বোঝানো। এখানে সাহসিকতা হলো সম্পর্ক।

২. হাকীকত ও মাজায-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُهُمَا):

- হাকীকতের হুকুম:

শব্দের মূল বা হাকীকী অর্থের ওপর আমল করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। বিনা কারণে বা বিনা দলিলে হাকীকত ছেড়ে মাজাযের দিকে যাওয়া জায়েজ নয়।

- *নীতিমালা:* **"আল-আসলু হুয়ার রজু ইলাল হাকীকাহ"** (মূল হলো হাকীকতের দিকে ফিরে যাওয়া)।

- মাজাযের হুকুম:

যদি কোনো কারণে হাকীকী অর্থের ওপর আমল করা কঠিন বা অসম্ভব (মুতাআজ্জির) হয়, অথবা কোনো শক্তিশালী দলিল (কারিনা) পাওয়া যায়, কেবল তখনই মাজাযী বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হয়। হাকীকত কার্যকর থাকলে মাজায বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. হাকীকত ও মাজায কি একত্রে জমা হতে পারে? (هَلْ يَجْتَمِعَانِ؟):

একই শব্দে একই সময়ে হাকীকত ও মাজায উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে কি না—এ নিয়ে উসুলবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

- হানাফি মাজহাবের মত (ইমাম আবু হানিফা ও বাযদাবী রহ.):

হানাফিদের অকাট্য সিদ্ধান্ত হলো:

"لَا يَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مَعًا."

(একই শব্দে হাকীকত ও মাজায একত্রে জমা হতে পারে না।)

যুক্তি: হাকীকত হলো 'আসল' আর মাজায হলো তার 'প্রতিনিধি' বা খলিফা। আসল উপস্থিত থাকলে প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই, আর প্রতিনিধি কাজ করলে আসলের কাজ বন্ধ থাকে। যেমন—একই ব্যক্তি একই সময়ে ওজু করা অবস্থায় এবং তায়াম্মুম করা অবস্থায় নামাজ পড়তে পারে না (পানি থাকলে তায়াম্মুম বাতিল)। ঠিক তেমনি, হাকীকত থাকলে মাজায বাতিল।

উদাহরণ: কেউ শপথ করল, **"আমি এই গাছ থেকে খাব না।"**

- **হাকীকত:** গাছের কাঠ বা ডাল খাওয়া (যা মানুষ খায় না)।
- **মাজায:** গাছের ফল খাওয়া।
- **সিদ্ধান্ত:** যেহেতু কাঠ খাওয়া অসম্ভব (হাকীকত অচল), তাই এখানে শুধু 'ফল খাওয়া' (মাজায) উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু যদি কেউ কাঠ ও ফল দুটোই উদ্দেশ্য নেয়, তবে তা হানাফি মতে বাতিল।

- শাফেয়ী মাজহাবের মত:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দ দ্বারা হাকীকত ও মাজায উভয় অর্থ একসাথে নেওয়া জায়েজ। একে তারা 'উমুমে মাজায' বলেন।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, হাকীকত ও মাজায হলো শরিয়তের শব্দার্থ বোঝার দুটি ভিন্ন রাস্তা। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো শব্দের আসল (হাকীকী) অর্থ গ্রহণ করা। যদি তা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই আমরা রূপক (মাজায) অর্থের দিকে যাব। এক সাথে দুই নৌকায় পা দেওয়া বা দুই অর্থ নেওয়া হানাফি উসুলে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-২৭: 'সরীহ' ও 'কিনায়া'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এদের হুকুম বা বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

عرف الصريح والكناية لغة واصطلاحا - وما حكمهما؟ بين بالتفصيل والتمثيل

উত্তর:

ভূমিকা:
উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের ব্যবহারের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে শব্দকে যেমন হাকীকত ও মাজাযে ভাগ করা হয়, তেমনি অর্থের প্রকাশভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে আরও দুই ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো—১. সরীহ (স্পষ্ট) এবং ২. কিনায়া (অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতবহ)।

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, বিবাহ, তালাক এবং অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে কোনটি কার্যকর হবে আর কোনটি হবে না, তা নির্ভর করে শব্দটি সরীহ না কিনায়া—তার ওপর। নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. 'সরীহ'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الصَّرِيحِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'সরীহ' (الصَّرِيحُ) শব্দের অর্থ হলো—স্পষ্ট, উন্মুক্ত, বিশুদ্ধ বা ভেজালহীন। যেমন বলা হয়—'আরবিয়্যুন সরীহুন' (বিশুদ্ধ আরবি ভাষী)।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ مَا انْكَشَفَ الْمُرَادُ مِنْهُ فِي السَّمْعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ."

(সরীহ হলো এমন শব্দ, যা কানে শোনার সাথে সাথেই তার উদ্দেশ্য বা অর্থ শ্রোতার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, কোনো চিন্তা-ভাবনা বা অনুমানের প্রয়োজন হয় না।)

কারণ, শব্দটি সমাজে ওই নির্দিষ্ট অর্থেই বহুল প্রচলিত।

- উদাহরণ:

যেমন—তালাক দেওয়ার জন্য "তোমাকে তালাক দিলাম" (أَنْتِ طَالِقٌ) বলা। অথবা কেনা-বেচার সময় "আমি বিক্রি করলাম" বা "আমি কিনলাম" বলা। এই শব্দগুলো শোনার পর অন্য কোনো অর্থ বোঝার অবকাশ থাকে না।

২. 'সরীহ'-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الصَّرِيحِ):

সরীহ শব্দের বিধান হলো:

"ثُبُوتُ الْمُوجَبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى النِّيَّةِ."

(সরীহ শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথেই তার বিধান কার্যকর হয়ে যায়, এতে বক্তার নিয়ত বা ইচ্ছার কোনো প্রয়োজন নেই।)

- **বিশ্লেষণ:** যদি কেউ রাগের মাথায় বা ঠাট্টা করে তার স্ত্রীকে বলে "তোমাকে তালাক দিলাম", তবে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে। পরে যদি সে কসম করে বলে,

"আমার মনে তালাকের নিয়ত ছিল না", কাজীর দরবারে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ শব্দটি 'সরীহ', আর সরীহ শব্দ নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়।

৩. 'কিনায়া'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْكِنَايَةِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'কিনায়া' (الْكِنَايَةُ) শব্দের অর্থ হলো—গোপন করা বা ইশারায় বলা। সোজা কথা না বলে ঘুরিয়ে বলা।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِدَلَالَةِ حَالٍ أَوْ نِيَّةٍ."

(কিনায়া হলো এমন শব্দ, যার উদ্দেশ্য বা অর্থ গোপন থাকে এবং বক্তার নিয়ত অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা (দালালাতুল হাল) ছাড়া যার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না।)

- উদাহরণ:

যেমন—তালাকের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে বলা: "তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও" (اِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ) বা "তোমার রাস্তা দেখো"।

  - *ব্যাখ্যা:* এই কথাগুলোর অর্থ 'তালাক' হতে পারে, আবার 'বাবার বাড়ি বেড়াতে যাওয়া'ও হতে পারে। তাই এটি অস্পষ্ট বা কিনায়া।

৪. 'কিনায়া'-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الْكِنَايَةِ):

কিনায়া শব্দের বিধান হলো:

"لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ."

(কিনায়া শব্দ দ্বারা কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না বক্তার নিয়ত থাকে অথবা পরিস্থিতির দ্বারা তা নিশ্চিত হওয়া যায়।)

- **বিশ্লেষণ:** যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি তোমার বাবার বাড়ি চলে যাও"—এতে তালাক হবে না।

  - তবে যদি স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল?" এবং সে বলে, "আমার নিয়ত ছিল তালাক দেওয়া", তবেই তালাক হবে।

- আর যদি সে বলে, "আমি শুধু বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছি", তবে তার কথাই সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে এবং তালাক হবে না।

পার্থক্য সারসংক্ষেপ:

বিষয়	সরীহ (الصريح)	কিনায়া (الكناية)
স্পষ্টতা	অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট।	অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন।
নিয়ত	নিয়তের প্রয়োজন নেই।	নিয়ত বা পরিস্থিতির প্রয়োজন আছে।
ফলাফল	বলার সাথে সাথে বিধান কার্যকর হয়।	নিয়ত না থাকলে বিধান কার্যকর হয় না।
তালাকের ক্ষেত্রে	'তালাক' শব্দটি সরীহ।	'মুক্ত তুমি' শব্দটি কিনায়া।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, 'সরীহ' ও 'কিনায়া' হলো মনের ভাব প্রকাশের দুটি ভিন্ন মাধ্যম। শরিয়ত বিচারিক ফয়সালা বা 'কাজা'-এর ক্ষেত্রে সরীহ শব্দের ওপর ভিত্তি করে রায় দেয়, সেখানে মনের খবর যাচাই করা হয় না। কিন্তু কিনায়া শব্দের ক্ষেত্রে মানুষের নিয়ত বা অন্তরের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর এই বিভাজন ফিকহী মাসআলা, বিশেষ করে তালাক ও লেনদেনের জটিলতা নিরসনে অত্যন্ত কার্যকরী।

প্রশ্ন-২৮: 'মুফাসসার' ও 'মুহকাম'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এদের হুকুম বা বিধান এবং পার্থক্য বর্ণনা কর।

عرف المفسر والمحكم - وما حكمهما؟ وما الفرق بينهما؟ بين بالمثال

উত্তর:

ভূমিকা:
উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের অর্থের স্পষ্টতার (জহুরুল মা'না) ভিত্তিতে শব্দকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে: জাহির, নস, মুফাসসার ও মুহকাম। এর মধ্যে প্রথম দুটি (জাহির ও নস) সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতার দিক থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি স্তর হলো 'মুফাসসার' (الْمُفَسَّرُ) এবং 'মুহকাম' (الْمُحْكَمُ)। এই দুটির অর্থ এতটাই পরিষ্কার যে, এতে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ থাকে না। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা ও বিধান আলোচনা করা হলো।

১. 'মুফাসসার'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُفَسَّرِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুফাসসার' শব্দের অর্থ হলো—ব্যাখ্যাকৃত, স্পষ্টীকৃত বা খোলাসা করা।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ مَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّصِّ، وَلَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَالتَّخْصِيصَ، وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ."

(মুফাসসার হলো এমন শব্দ, যার স্পষ্টতা 'নস'-এর চেয়েও বেশি। এতে কোনো প্রকার তাবিল (ভিন্ন ব্যাখ্যা) বা তাখসীস (নির্দিষ্টকরণ)-এর সম্ভাবনা নেই। তবে ওহী নাজিলের যুগে এটি মানসুখ বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখত।)

- উদাহরণ:

পবিত্র কুরআনে জিনার অপবাদ বা 'কজফ'-এর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"

(তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। - সূরা নূর: ৪)

বিশ্লেষণ: এখানে **'সামানিনা'** (আশি) শব্দটি মুফাসসার। কারণ ৮০ সংখ্যাটি একেবারে সুনির্দিষ্ট। একে ব্যাখ্যা করে ৭৯ বা ৮১ বানানোর কোনো সুযোগ নেই। এর অর্থ অকাট্য, তবে রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় হুকুমটি রহিত হওয়ার সুযোগ ছিল।

২. 'মুহকাম'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُحْكَمِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুহকাম' শব্দের অর্থ হলো—সুদৃঢ়, মজবুত, বা যা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا كَانَ أَقْوَى مِنَ الْمُفَسَّرِ، لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَلَا التَّخْصِيصَ وَلَا النَّسْخَ."

(মুহকাম হলো স্পষ্টতার সর্বোচ্চ স্তর, যা মুফাসসারের চেয়েও শক্তিশালী। এতে তাবিল বা তাখসীসের তো সুযোগ নেই-ই, এমনকি এটি মানসুখ বা রহিত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা রাখে না।)

- উদাহরণ:

ইসলামের মৌলিক আকিদা ও শাশ্বত বিধানসমূহ। যেমন—আল্লাহ বলেন:

"إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

(নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।)

বিশ্লেষণ: আল্লাহর এই গুণাবলী এবং তাওহীদ বা রিসালাতের বিষয়গুলো 'মুহকাম'। এগুলো কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন বা রহিত হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এটি অটল।

৩. মুফাসসার ও মুহকাম-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُهُمَا):

- **মুফাসসারের বিধান:** এর ওপর আমল করা **ওয়াজিব** এবং এর অর্থ **'কাতয়ী'** (অকাট্য)। তবে রাসূল (সা.)-এর যুগে এটি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর যেহেতু ওহী বন্ধ, তাই এখন মুফাসসারও মুহকামের মতো অপরিবর্তনীয় হয়ে গেছে।
- **মুহকামের বিধান:** এর ওপর আমল করা **ওয়াজিব** এবং এটি সর্বকালের জন্য অপরিবর্তনীয়। এর অর্থ বিশ্বাস করা ও মানা ফরজ।

৪. মুফাসসার ও মুহকামের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	মুফাসসার (المفسر)	মুহকাম (المحكم)
স্পষ্টতার স্তর	তৃতীয় স্তর (নস-এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট)।	চতুর্থ বা সর্বোচ্চ স্তর।
নাসখ বা রহিতকরণ	রাসূল (সা.)-এর যুগে রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।	এটি কখনোই রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না।
উদাহরণ	সংখ্যাবাচক বিধান (যেমন- ৮০ বেত্রাঘাত)।	আকিদা ও শাশ্বত সত্য (যেমন- তাওহীদ)।

৫. স্পষ্টতার ক্রমধারা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে স্পষ্ট শব্দের শক্তির ক্রম হলো:

জাহির < নস < মুফাসসার < মুহকাম।

অর্থাৎ, যদি মুফাসসার ও নস-এর মধ্যে বিরোধ হয়, তবে মুফাসসার প্রাধান্য পাবে। আর মুহকাম সবার উপরে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'মুফাসসার' ও 'মুহকাম' হলো কুরআনের অকাট্য আয়াতের প্রকারভেদ। মুফাসসার আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই, তাই আমরা হুবহু আমল করি। আর মুহকাম আয়াতগুলো হলো ইসলামের ভিত্তি, যা শরিয়তের অপরিবর্তনীয় মূলনীতি হিসেবে গণ্য।

প্রশ্ন-২৯: 'খফি' ও 'মুশকিল'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ তাদের হুকুম ও পার্থক্য বর্ণনা কর।

عرف الخفي والمشكل - وما حكمهما؟ وما الفرق بينهما؟ بين بالمثال

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতার (খফা বা ইবহাম) ওপর ভিত্তি করে শব্দকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: খফি, মুশকিল, মুজমাল ও মুতাশাবিহ। পূর্ববর্তী প্রশ্নে স্পষ্ট শব্দগুলো আলোচিত হয়েছে। এবার অস্পষ্টতার প্রাথমিক দুটি স্তর—'খফি' (الْخَفِيُّ) এবং 'মুশকিল' (الْمُشْكِلُ) নিয়ে আলোচনা করা হলো। এই দুটি প্রকারের অস্পষ্টতা দূর করা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক।

১. 'খফি'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْخَفِيِّ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'খফি' শব্দের অর্থ হলো—গোপন, অস্পষ্ট বা যা প্রকাশিত নয়। এটি 'জহির' বা স্পষ্ট-এর বিপরীত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ مَا خَفِيَ مُرَادُهُ بِعَارِضٍ فِي الصِّيغَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةِ."

(খফি হলো এমন শব্দ, যার অর্থ মূলত স্পষ্ট (জহির), কিন্তু কোনো বাহ্যিক কারণে (আরেজ) বা নতুন কোনো নামের আগমনের কারণে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অস্পষ্ট হয়ে গেছে।)

অর্থাৎ, শব্দটি নিজে কঠিন নয়, কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর সেটি প্রয়োগ করা যাবে কি না, তা নিয়ে খটকা লাগে।

- উদাহরণ:

'সারিক' (চোর) শব্দটি। এর অর্থ স্পষ্ট—যে গোপনে অন্যের মাল চুরি করে।

- *সমস্যা:* কিন্তু **'পকেটমার'** (তর্‌রার) বা **'কাফন চোর'** (নাব্বাশ)-কে কি 'চোর' বলা যাবে?
- *বিশ্লেষণ:* পকেটমার তো জাগ্রত মানুষের পকেট থেকে প্রকাশ্যে নেয় (চোরের চেয়ে বেশি ধূর্ত), আর কাফন চোর কবর থেকে নেয় (যেখানে মাল সুরক্ষিত নয়)। তাই এদের জন্য 'চোর' শব্দটি ব্যবহার করা 'খফি' বা একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এদের আলাদা নাম (তর্‌রার/নাব্বাশ) থাকায় 'চোর' শব্দটি এদের ওপর খাটবে কি না, তা নিয়ে চিন্তা করতে হয়।

২. 'মুশকিল'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُشْكِلِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুশকিল' অর্থ হলো—কঠিন, দুর্বোধ্য বা জটিল।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا زَادَ خَفَاؤُهُ عَلَى الْخَفِيِّ، وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ."

(মুশকিল হলো যার অস্পষ্টতা খফি-এর চেয়ে বেশি। শব্দটির অর্থের মধ্যেই এমন জটিলতা আছে যে, গভীর চিন্তা-ভাবনা (তাআম্মুল) এবং বাহ্যিক দলিলের সাহায্য ছাড়া এর অর্থ বোঝা যায় না।)

এখানে অস্পষ্টতা শব্দের ভেতরেই থাকে, বাইরে থেকে আসে না।

- উদাহরণ:

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ"

(তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে (স্ত্রীদের কাছে) গমন কর 'আন্না' (যেভাবে/যেখান থেকে) ইচ্ছা। - সূরা বাকারা: ২২৩)

- *বিশ্লেষণ:* এখানে **'আন্না'** (أَنَّى) শব্দটি মুশকিল। আরবি ভাষায় এই শব্দটি 'আইনা' (কোথায়), 'কাইফা' (কীভাবে), এবং 'মাতা' (কখন)—এই তিন অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। গভীর গবেষণার পর মুজতাহিদগণ রায় দিয়েছেন যে, এখানে 'কাইফা' বা পদ্ধতি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে কোনো আসনে সহবাস করা যাবে, তবে স্থান (শস্যক্ষেত/যৌনাঙ্গ) ঠিক রাখতে হবে।

৩. খফি ও মুশকিল-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُهُمَا):

- **খফি-এর হুকুম:** এর অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সাধারণ গবেষণা বা **'তলব'** (খোঁজ করা) যথেষ্ট। বিচারক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, পকেটমার বা কাফন চোরও চোরের সংজ্ঞায় পড়ে (বা পড়ে না)।
- **মুশকিল-এর হুকুম:** এর অর্থ উদ্ধারের জন্য গভীর গবেষণা বা **'ইজতিহাদ'** আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত দলিলের মাধ্যমে এর অর্থ স্পষ্ট না হয়, ততক্ষণ এর ওপর আমল স্থগিত থাকে বা মুজতাহিদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হয়।

৪. খফি ও মুশকিল-এর পার্থক্য (اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	খফি (الخفي)	মুশকিল (المشكل)
অস্পষ্টতার কারণ	অস্পষ্টতা শব্দের নিজের মধ্যে নেই, বরং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণে (যেমন আলাদা নাম থাকায়) সৃষ্টি হয়।	অস্পষ্টতা শব্দের নিজস্ব গঠনের মধ্যেই থাকে। শব্দটির অর্থই জটিল।
অস্পষ্টতার মাত্রা	অস্পষ্টতা কম (প্রথম স্তর)।	অস্পষ্টতা বেশি (দ্বিতীয় স্তর)।
সমাধান পদ্ধতি	সামান্য চিন্তা বা 'তলব' করলেই অস্পষ্টতা দূর হয়।	গভীর চিন্তা বা 'তাআম্মুল' ছাড়া অস্পষ্টতা দূর হয় না।
উদাহরণ	চোর ও পকেটমার।	'আন্না' শব্দের অর্থ নির্ণয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'খফি' ও 'মুশকিল' হলো কুরআনের অর্থ বোঝার পথে দুটি প্রাথমিক বাধা। খফি-এর সমস্যা হলো প্রয়োগের (Application), আর মুশকিল-এর সমস্যা হলো অর্থের (Meaning)। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে, একজন ফকিহকে এই জটগুলো খুলে সঠিক বিধান বের করতে হয়, যেমন হানাফি ফকিহগণ পকেটমারকে চোরের চেয়ে বড় অপরাধী সাব্যস্ত করে তার ওপর চুরির হদ (হাত কাটা) প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন-৩০: 'মুজমাল' ও 'মুতাশাবিহ'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এদের হুকুম ও পার্থক্য বর্ণনা কর।

عرف المجمل والمتشابه - وما حكمهما؟ وما الفرق بينهما؟ بين بالمثال

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শব্দের অর্থের অস্পষ্টতার (ইবহাম) চারটি স্তরের মধ্যে 'খফি' ও 'মুশকিল' সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে। অস্পষ্টতার সর্বোচ্চ দুটি স্তর হলো 'মুজমাল' (الْمُجْمَلُ) এবং 'মুতাশাবিহ' (الْمُتَشَابِهُ)। এই শব্দগুলোর অর্থ অভিধান বা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, বরং এর জন্য ওহীর ব্যাখ্যা বা খোদায়ী ইলমের প্রয়োজন। নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. 'মুজমাল'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُجْمَلِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুজমাল' শব্দের অর্থ হলো—সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট বা একত্রিত।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর মতে:

"مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّمِ."

(মুজমাল হলো এমন শব্দ, যার উদ্দেশ্য বা অর্থ এতটাই অস্পষ্ট যে, তা বুদ্ধি বা কিয়াস দ্বারা বোঝা যায় না। এর অর্থ বোঝার জন্য বক্তা (আল্লাহ বা রাসূল)-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা (বায়ান) আসা অপরিহার্য।)

- উদাহরণ:

পবিত্র কুরআনের শব্দ 'রিবা' (সুদ) বা 'সালাত' (নামাজ)।

  - *বিশ্লেষণ:* আভিধানিক অর্থে 'রিবা' মানে বৃদ্ধি, আর 'সালাত' মানে দোয়া। কিন্তু শরিয়তে সব বৃদ্ধি রিবা নয় এবং সব দোয়া সালাত নয়। আল্লাহ ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা বুদ্ধি দিয়ে বের করা সম্ভব ছিল না। রাসূল (সা.) যখন ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, "এই এই পদ্ধতিতে বৃদ্ধি হলে তা রিবা" এবং "এই নিয়মে রুকু-সিজদা করলে তা সালাত", তখনই কেবল এর অর্থ স্পষ্ট হলো। ব্যাখ্যার আগ পর্যন্ত এগুলো 'মুজমাল' ছিল।

২. 'মুতাশাবিহ'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُتَشَابِهِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুতাশাবিহ' শব্দের অর্থ হলো—সাদৃশ্যপূর্ণ বা বিভ্রান্তিকর।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هُوَ مَا انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا".

(মুতাশাবিহ হলো অস্পষ্টতার সর্বোচ্চ স্তর। এর প্রকৃত অর্থ জানার আশা দুনিয়াতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ ছাড়া এর প্রকৃত মর্মার্থ কেউ জানে না।)

এর অর্থ জানার জন্য কোনো ব্যাখ্যা বা বয়ান আসে না এবং বুদ্ধিও সেখানে অচল।

- উদাহরণ:

১. হুরুফে মুকাত্তাআ'ত: সূরার শুরুতে আসা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। যেমন—'আলিফ-লাম-মীম' (الم), 'হা-মীম' (حم)। এগুলোর অর্থ কেউ জানে না।

২. আল্লাহর সিফাত: যেমন—"ইয়াদুল্লাহ" (আল্লাহর হাত), "ওয়াজহুল্লাহ" (আল্লাহর চেহারা)। এগুলোর শাব্দিক অর্থ আমরা জানি, কিন্তু আল্লাহর শান অনুযায়ী এর প্রকৃত হাকীকত বা ধরণ (কাইফিয়াত) আমাদের অজানা।

৩. মুজমাল ও মুতাশাবিহ-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُهُمَا):

- মুজমালের হুকুম:

১. এর অর্থের সত্যতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. বক্তা (শারে') থেকে ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত আমল স্থগিত রাখা (তাওয়াক্কুফ)।

৩. ব্যাখ্যা আসার পর তা আমল করা। (ব্যাখ্যা আসলে এটি 'মুফাসসার' হয়ে যায়)।

- মুতাশাবিহ-এর হুকুম:

১. দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা বুঝিয়েছেন তা-ই সত্য।

২. এর অর্থ নিয়ে গবেষণা বা খোঁড়াখুঁড়ি না করা।

৩. এর প্রকৃত ইলম আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা (তাফবীজ)।

৪. মুজমাল ও মুতাশাবিহ-এর পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	মুজমাল (المجمل)	মুতাশাবিহ (المتشابه)
অস্পষ্টতার স্তর	তৃতীয় স্তর (অস্পষ্টতা কঠিন, তবে সমাধানযোগ্য)।	চতুর্থ বা সর্বোচ্চ স্তর (অস্পষ্টতা স্থায়ী)।
অর্থ জানার উপায়	শরিয়তের প্রবর্তক (আল্লাহ/রাসূল)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা জানা সম্ভব।	আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জানার উপায় নেই।
গবেষণার সুযোগ	ব্যাখ্যার পর এটি স্পষ্ট হয়ে যায়।	কোনো ব্যাখ্যা আসে না, তাই গবেষণাও নিষিদ্ধ।
উদাহরণ	সালাত, যাকাত, রিবা।	আলিফ-লাম-মীম, ইয়াদুল্লাহ।

৫. অস্পষ্টতার ক্রমধারা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে অস্পষ্ট শব্দের জটিলতার ক্রম হলো:

খফি < মুশকিল < মুজমাল < মুতাশাবিহ।

অর্থাৎ, খফি এবং মুশকিলের সমাধান মানুষের গবেষণায় (ইজতিহাদ) হতে পারে, কিন্তু মুজমালের জন্য ওহীর ব্যাখ্যা লাগে, আর মুতাশাবিহ আল্লাহর ইলমে সীমাবদ্ধ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'মুজমাল' ও 'মুতাশাবিহ' হলো মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। মুজমাল শব্দগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে শরিয়তের বিধানে পরিণত হয়েছে (যেমন—নামাজ, যাকাত)। আর মুতাশাবিহ শব্দগুলো বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য রাখা হয়েছে, যাতে বান্দা না দেখেও আল্লাহর কালামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে।

প্রশ্ন-৩১: 'আজীমত' ও 'রুখসত'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ রুখসতের প্রকারভেদগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।

عرف العزيمة والرخصة لغة واصطلاحا - ثم بين أنواع الرخصة بالتفصيل والتمثيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শরিয়তের বিধান বা 'হুকুম' পালনের বাধ্যবাধকতার ওপর ভিত্তি করে বিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: 'আজীমত' (العَزِيمَةُ) এবং 'রুখসত' (الرُّخْصَةُ)। ইসলামি শরিয়ত মূলত সহজতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা যেমন জরুরি, তেমনি ওজর বা অসুবিধার কারণে তিনি যে ছাড় দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাও তাঁর রহমত। নিম্নে আজীমত ও রুখসতের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. আজীমত ও রুখসতের পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ):

- **(ক) আজীমত (الْعَزِيمَةُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** 'আজীমত' শব্দের অর্থ হলো—দৃঢ় সংকল্প, শক্ত গিট বা অটল সিদ্ধান্ত।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا شُرِعَ ابْتِدَاءً لَا لِعُذْرٍ."

(আজীমত হলো এমন বিধান, যা শুরু থেকেই বান্দার ওপর আবশ্যিক হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কোনো ওজর বা অসুবিধার কারণে নয়।)

এটি শরিয়তের মৌলিক বা আসল বিধান।

  - **উদাহরণ:** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, জিনা না করা ইত্যাদি। এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সবার জন্য ফরজ বা আজীমত।

- **(খ) রুখসত (الرُّخْصَةُ):**
  - **আভিধানিক অর্থ:** 'রুখসত' শব্দের অর্থ হলো—সহজতা, কোমলতা বা ছাড় দেওয়া।
  - **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا شُرِعَ بِنَاءً عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ."

(রুখসত হলো এমন বিধান, যা বান্দার ওজর বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবর্তন বা সহজ করা হয়েছে, যদিও মূল কারণটি (নিষেধাজ্ঞা) বিদ্যমান থাকে।)

- **উদাহরণ:** মুসাফির অবস্থায় চার রাকাত নামাজ দুই রাকাত (কসর) পড়া, অথবা অসুস্থ অবস্থায় বসে নামাজ পড়া।

২. রুখসতের প্রকারভেদ (أَنْوَاعُ الرُّخْصَةِ):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এবং হানাফি উসুলবিদগণ রুখসতকে বিধানের শিথিলতার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করেছেন:

- (১) রুখসতে তারফীহ (رُخْصَةُ تَرْفِيهٍ - শাস্তিমুক্তির ছাড়):

এই প্রকারের রুখসতে কাজটি করা হারামই থাকে, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির কারণে পরকালের শাস্তি মাফ করে দেওয়া হয়।

- **বিধান:** কাজটি না করে ধৈর্য ধারণ করা বা শহীদ হওয়া উত্তম।
- **উদাহরণ:** যদি কাউকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে **'কালিমায়ে কুফর'** (কুফরি বাক্য) বলতে বাধ্য করা হয়, আর সে জান বাঁচানোর জন্য শুধু মুখে তা বলে (অন্তরে বিশ্বাস ঠিক রেখে), তবে সে কাফের হবে না। তবে না বলে শহীদ হওয়াটা 'আজীমত' এবং বেশি সওয়াবের কাজ।

- (২) রুখসতে ইসকাত (رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ - দায়িত্ব মুক্তির ছাড়):

এই প্রকারে বান্দার ওপর থেকে কষ্টের কারণে আবশ্যিক দায়িত্বটি সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হয় বা কমিয়ে দেওয়া হয়।

- **বিধান:** এই ছাড় গ্রহণ করা বৈধ, তবে সক্ষম হলে মূল কাজটি করা উত্তম।
- **উদাহরণ:** মুসাফিরের জন্য রমজানের **রোজা না রাখা** বা কসর পড়া। মুসাফির যদি কষ্ট সহ্য করে রোজা রাখে, তবে তা আদায় হবে এবং সওয়াব বেশি হবে। কিন্তু না রাখলেও গুনাহ হবে না।

- (৩) রুখসতে ইবাহাত (رُخْصَةُ إِبَاحَةٍ - বৈধতার ছাড়):

এই প্রকারে নিষিদ্ধ কাজটি সাময়িকভাবে হালাল বা বৈধ হয়ে যায়।

- **বিধান:** জীবন বাঁচানোর জন্য এই ছাড় গ্রহণ করা ওয়াজিব। এ সময় আজীমতের ওপর আমল করা (না খেয়ে মারা যাওয়া) হারাম।
- **উদাহরণ:** তীব্র ক্ষুধা বা পিপাসায় কেউ মারা যাচ্ছে, হালাল খাবার নেই। এমতাবস্থায় **মৃত প্রাণী (মাইতাহ) খাওয়া বা মদ পান করা** তার জন্য হালাল। যদি সে পরহেজগারি দেখাতে গিয়ে না খায় এবং মারা যায়, তবে সে গুনাহগার হবে।

- (৪) পূর্ববর্তী উম্মতের কঠিন বিধান রহিতকরণ:

এমন কিছু বিধান যা বনি ইসরাইল বা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর কঠোর ছিল, কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীর সম্মানে তা সহজ করা হয়েছে। একেও রূপক অর্থে রুখসত বলা হয়।

- **উদাহরণ:** কাপড় নাপাক হলে তা কেটে ফেলার বিধান ছিল, এখন ধুয়ে ফেললেই হয়। গনিমতের মাল আগে হারাম ছিল, এখন হালাল।

৩. আজীমত ও রুখসতের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	আজীমত (العزيمة)	রুখসত (الرخصة)
ভিত্তি	স্বাভাবিক অবস্থা ও মূল আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।	বান্দার ওজর ও অপারগতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
উদ্দেশ্য	আল্লাহ তাআলার হক ও পরীক্ষা পূর্ণ করা।	বান্দার প্রতি দয়া ও সহজীকরণ।
অগ্রাধিকার	সাধারণত আজীমতের ওপর আমল করা উত্তম (তাকওয়া)।	জীবননাশের শঙ্কা থাকলে রুখসতের ওপর আমল করা ওয়াজিব।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আজীমত হলো শরিয়তের মেরুদণ্ড, আর রুখসত হলো তার সৌন্দর্য। আল্লাহ তাআলা চান বান্দা তাঁর নির্দেশ মানুক, কিন্তু তিনি চান না বান্দা অহেতুক কষ্টে পড়ুক। ইমাম বাযদাবি (রহ.)-এর এই বিশ্লেষণ আমাদের শেখায় যে, ইসলাম কোনো অনড় বা স্থবির ধর্ম নয়, বরং এটি মানুষের সাধ্য ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৩২: 'সাবাব' ও 'ইল্লত'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

عرف السبب والعلة - وما الفرق بينهما؟ بين بالمثال

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শরিয়তের বিধান (হুকুম) সাব্যস্ত হওয়ার পেছনে যে মাধ্যম বা কারণগুলো কাজ করে, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিধানের পেছনে কোনো না কোনো কারণ বা হেকমত রেখেছেন। উসূলবিদগণ এই কারণগুলোকে তাদের প্রভাব ও প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে 'সাবাব' (السَّبَبُ) এবং 'ইল্লত' (الْعِلَّةُ) নামক দুটি পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, কিয়াস বা সাদৃশ্য মূলক বিধান বের করার জন্য এই দুটির পার্থক্য বোঝা মুজতাহিদের জন্য অপরিহার্য।

১. 'সাবাব'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ السَّبَبِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'সাবাব' (السَّبَبُ) শব্দের অর্থ হলো—রশি, মাধ্যম, বা যা কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ مَا كَانَ طَرِيقًا إِلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةٍ."

(সাবাব হলো এমন বিষয়, যা বিধানের দিকে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তবে বিধানটি সরাসরি এর দ্বারা কার্যকর হয় না, বরং অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।)

সহজ কথায়, সাবাব উপস্থিত থাকলে বিধান আসে, কিন্তু সাবাব ও বিধানের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো মিল (মুনাসাবাত) থাকা জরুরি নয়।

- উদাহরণ:

ওয়াক্ত বা সময়: নামাজের ওয়াক্ত হওয়া (সূর্য ঢলে পড়া) হলো জোহরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার 'সাবাব'।

- *বিশ্লেষণ:* সূর্য ঢলে পড়ার সাথে নামাজ পড়ার কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু আল্লাহ একেই নামাজের কারণ বা সাবাব বানিয়েছেন।

২. 'ইল্লত'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعِلَّةِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'ইল্লত' (الْعِلَّةُ) শব্দের অর্থ হলো—রোগ, পরিবর্তন বা কারণ। রোগকে ইল্লত বলা হয় কারণ তা মানুষের সুস্থ অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هِيَ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ الْحُكْمُ ابْتِدَاءً لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا."

(ইল্লত হলো এমন বিষয়, যার দিকে বিধানটি সরাসরি সম্পৃক্ত হয় এবং উভয়ের মাঝে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক বা 'মুনাসাবাত' বিদ্যমান থাকে।)

অর্থাৎ, ইল্লত দেখলেই বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারে কেন বিধানটি দেওয়া হয়েছে।

- উদাহরণ:

নিশা বা মাদকতা: মদ হারাম হওয়ার ইল্লত হলো 'ইস্কার' বা মাদকতা।

- *বিশ্লেষণ:* মদ খেলে বুদ্ধি লোপ পায়, তাই তা হারাম। এখানে হারাম হওয়া এবং মাদকতার মাঝে স্পষ্ট যৌক্তিক সম্পর্ক আছে। তাই এটি সাবাব নয়, বরং 'ইল্লত'।

৩. সাবাব ও ইল্লতের পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদদের মতে এদের মূল পার্থক্য নিম্নরূপ:

বিষয়	সাবাব (السبب)	ইল্লত (العلة)
সম্পর্কের ধরণ	সাবাব ও বিধানের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক (মুনাসাবাত) থাকা জরুরি নয়।	ইল্লত ও বিধানের মাঝে অবশ্যই যৌক্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে।
কিয়াসের ভিত্তি	সাবাবের ওপর ভিত্তি করে 'কিয়াস' (Analogy) করা যায় না।	ইল্লতের ওপর ভিত্তি করেই 'কিয়াস' করা হয়।

প্রভাব	এটি বিধানের মাধ্যম মাত্র, সরাসরি প্রভাবক নয়।	এটি বিধানের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে (মুআসসির)।
উদাহরণ	রমজানের চাঁদ দেখা (রোজার সাবাব)।	মাদকতা (মদ হারামের ইল্লত)।

৪. সাবাব ও ইল্লতের একত্রীকরণ:

কখনো কখনো একটি বিষয় একই সাথে সাবাব এবং ইল্লত হতে পারে। হানাফি পরিভাষায় একে 'সাবাবুন ফি মানাল ইল্লত' (ইল্লতের অর্থবোধক সাবাব) বলা হয়।

- **উদাহরণ: বেচাকেনা (বাই):** বেচাকেনা হলো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সাবাব এবং ইল্লত—উভয়টিই। কারণ এর মাধ্যমেই মালিকানা আসে (সাবাব) এবং এর যৌক্তিক কাজই হলো মালিকানা পরিবর্তন করা (ইল্লত)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'সাবাব' হলো শরিয়তের বিধানের বাহ্যিক চাবি, আর 'ইল্লত' হলো তার অভ্যন্তরীণ রুহ বা যুক্তি। নামাজের জন্য সময় হলো সাবাব (যা পরিবর্তন করা যায় না), কিন্তু হুকুমের বিস্তৃতির জন্য ইল্লত (যেমন- মাদকতা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুজতাহিদগণ ইল্লত খুঁজে বের করেই নতুন নতুন মাসআলার সমাধান দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন-৩৩: 'শর্ত' ও 'আলামত'-এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এদের হুকুম ও পার্থক্য বর্ণনা কর।

عرف الشرط والعلامة - وما حكمهما؟ وما الفرق بينهما؟ بين بالمثال

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. সাবাব, ২. ইল্লত, ৩. শর্ত এবং ৪. আলামত। পূর্ববর্তী প্রশ্নে সাবাব ও ইল্লত আলোচিত হয়েছে। এই চার প্রকারের মধ্যে অবশিষ্ট দুটি হলো 'শর্ত' (الشرط) এবং 'আলামত' (العلامة)। বিধানের কার্যকারিতা ও পরিচিতির ক্ষেত্রে এই দুটির ভূমিকা ভিন্ন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এগুলোর সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

১. 'শর্ত'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الشَّرْطِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'শর্ত' (الشَّرْطُ) শব্দের অর্থ হলো—চিহ্ন বা আলামত। তবে এর বহুশচন 'শুরুত' (شُرُوطٌ) হলে অর্থ হয় সন্ধি বা চুক্তি।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّرًا فِيهِ."

(শর্ত হলো এমন বিষয়, যার ওপর বিধানের অস্তিত্ব বা কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু এটি বিধানের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বা বিধানকে ওয়াজিব করে না।)

অর্থাৎ, শর্ত না থাকলে বিধান বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু শর্ত থাকলেই যে বিধান পালন করতে হবে—এমন নয়। এটি বিধানের বাইরে থাকে (খালেদ)।

- উদাহরণ:

নামাজের জন্য 'ওজু' বা পবিত্রতা।

  - *বিশ্লেষণ:* নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ওজু থাকা 'শর্ত'। ওজু না থাকলে নামাজ হবে না। কিন্তু কারো ওজু থাকলেই তার ওপর নামাজ ফরজ হয়ে যায় না (যতক্ষণ না ওয়াক্ত হয়)। অর্থাৎ ওজু নামাজের বৈধতা দেয়, কিন্তু আবশ্যিকতা আনে না।

২. 'আলামত'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعَلَامَةِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'আলামত' (الْعَلَامَةُ) অর্থ হলো—নিদর্শন, চিহ্ন বা পরিচিতি।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هِيَ مَا يُعَرِّفُ الْحُكْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِيهِ وَلَا تَوَقُّفٌ عَلَيْهِ."

(আলামত হলো যা কেবল বিধানের পরিচিতি ঘটায় বা বিধানের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিধানের অস্তিত্ব বা বৈধতা এর ওপর নির্ভর করে না এবং এটি বিধানের ওপর কোনো প্রভাবও ফেলে না।)

- উদাহরণ:

নামাজের জন্য 'আজান'।

- *বিশ্লেষণ:* আজান হলো নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার একটি 'আলামত' বা চিহ্ন। আজান শুনলে আমরা বুঝি নামাজের সময় হয়েছে। কিন্তু আজান না দিলেও যদি কেউ ওয়াক্তমতো নামাজ পড়ে, তার নামাজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নামাজের বৈধতা আজানের ওপর নির্ভরশীল নয়, আজান শুধু পরিচয়কারী।

৩. শর্ত ও আলামত-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُهُمَا):

- **শর্তের বিধান:** শর্ত পাওয়া গেলে বিধানটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর হয়। আর শর্ত না পাওয়া গেলে বিধানটি বাতিল (ফাসিদ/বাতিল) হয়ে যায়। (যেমন—ওজু ছাড়া নামাজ বাতিল)।
- **আলামতের বিধান:** এটি কেবল বিধানের জ্ঞান দান করে। আলামত পাওয়া গেলে বিধানের উপস্থিতি বোঝা যায়, কিন্তু আলামত না থাকলেও বিধান থাকতে পারে।

৪. শর্ত ও আলামত-এর পার্থক্য (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا):

বিষয়	শর্ত (الشرط)	আলামত (العلامة)
নির্ভরশীলতা	বিধানের অস্তিত্ব বা বৈধতা শর্তের ওপর নির্ভরশীল।	বিধানের অস্তিত্ব আলামতের ওপর নির্ভরশীল নয়।
কাজ	এটি বিধানকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করে।	এটি কেবল বিধানের খবর দেয় বা পরিচয় ঘটায়।
অপরিহার্যতা	শর্ত ছাড়া 'মাশহুত' (মূল কাজ) আদায় হয় না।	আলামত ছাড়াও মূল কাজ আদায় হয়ে যায়।
উদাহরণ	ওজু (নামাজের জন্য)।	আজান (নামাজের ওয়াক্তের জন্য)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'সাবাব' ও 'ইল্লত' বিধানকে ওয়াজিব করে, 'শর্ত' বিধানকে সহীহ বা শুদ্ধ করে, আর 'আলামত' বিধানের পরিচয় দেয়। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মতে, ওজু হলো নামাজের শর্ত, আর আজান হলো আলামত। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝলে ফিকহী মাসআলায় বড় ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন-৩৪: 'আহলিয়াত'-এর সংজ্ঞা দাও। আহলিয়াত কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف الأهلية - وكم قسما لها؟ بين بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো 'মাহকুম আলাইহি' বা যার ওপর হুকুম আরোপিত হয় (অর্থাৎ মানুষ)। মানুষের ওপর শরিয়তের হুকুম বা বিধান কখন এবং কীভাবে বর্তাবে, তা নির্ভর করে তার যোগ্যতা বা 'আহলিয়াত' (الأَهْلِيَّةُ)-এর ওপর। পাগল বা শিশুর ওপর শরিয়তের সব হুকুম ফরজ হয় না, কারণ তাদের সেই আহলিয়াত নেই। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) আহলিয়াতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

১. 'আহলিয়াত'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الأَهْلِيَّةِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'আহলিয়াত' শব্দটি 'আহলুন' (أَهْلٌ) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—যোগ্যতা, উপযোগিতা বা উপযুক্ততা (Salahiyah)।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসূলবিদগণের মতে:

"هِيَ صَلَاحِيَةُ الْإِنْسَانِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَلِصِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْهُ."

(আহলিয়াত হলো মানুষের এমন যোগ্যতা, যার মাধ্যমে সে নিজের প্রাপ্য অধিকার লাভ করতে পারে, অন্যের অধিকার তার ওপর সাব্যস্ত হয় এবং তার কথা ও কাজ শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়।)

২. আহলিয়াতের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الأَهْلِيَّةِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) আহলিয়াতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- **(ক) আহলিয়াতুল ওজুব (أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ) - অধিকার ও দায়িত্বের যোগ্যতা:**
  - **সংজ্ঞা:** এটি মানুষের এমন যোগ্যতা, যার কারণে শরিয়তের অধিকারগুলো তার অনুকূলে বা প্রতিকূলে সাব্যস্ত হয়। এটি মানুষের **'জিম্মাহ'** (Legal Personality) বা প্রাণসত্তার ওপর নির্ভরশীল।

- **ভিত্তি:** এর ভিত্তি হলো **'হায়াত'** বা জীবন। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ এই যোগ্যতা আছে।
- প্রকার: এটি আবার দুই প্রকার:

১. না-কিসাহ (অপূর্ণ): যেমন—মায়ের পেটের ভ্রূণ (জানিন)। ভ্রূণের কেবল অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা আছে (যেমন—উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়া), কিন্তু তার ওপর কোনো দায়িত্ব (যেমন—ঋণ) বর্তায় না।

২. কামিলাহ (পূর্ণ): জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি জীবিত মানুষের এই যোগ্যতা থাকে। এর কারণে তার ওপর অন্যের পাওনা সাব্যস্ত হয় এবং সেও অন্যের কাছে পাওনাদার হতে পারে।

- **(খ) আহলিয়াতুল আদা (أَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ) - প্রয়োগ বা আদায়ের যোগ্যতা:**
  - **সংজ্ঞা:** এটি এমন যোগ্যতা, যার মাধ্যমে মানুষের কথা ও কাজ শরিয়তে ধর্তব্য ও কার্যকর হয়। অর্থাৎ সে নামাজ পড়লে আদায় হবে, বেচাকেনা করলে তা শুদ্ধ হবে, অপরাধ করলে শাস্তি হবে।
  - **ভিত্তি:** এর ভিত্তি হলো **'আকল'** (বুদ্ধি) এবং **'বুলুগ'** (শারীরিক সাবালকত্ব)। শুধু জীবন থাকলেই হয় না, বুদ্ধিও থাকতে হয়।
  - প্রকার: এটিও দুই প্রকার:

১. কাসিরাহ (ত্রুটিপূর্ণ): বুঝমান শিশু (মুমায়্যিজ)। যে ভালো-মন্দ কিছুটা বুঝতে পারে কিন্তু বালেগ হয়নি। তার ইবাদত সহীহ হয়, লাভজনক লেনদেন (দান গ্রহণ) সহীহ হয়, কিন্তু ক্ষতিকর লেনদেন (দান করা/তালাক দেওয়া) বাতিল।

২. কামিলাহ (পরিপূর্ণ): যখন মানুষ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অবস্থায় বালেগ (সাবালক) হয়। তখন সে পূর্ণ 'মুকাল্লাফ' বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। তার সব ইবাদত ফরজ হয় এবং সব ধরনের লেনদেন ও শাস্তির যোগ্য সে বিবেচিত হয়।

৩. আহলিয়াতুল ওজুব ও আহলিয়াতুল আদার পার্থক্য:

বিষয়	আহলিয়াতুল ওজুব	আহলিয়াতুল আদা
মূল ভিত্তি	জীবন বা মানবসত্তা (জিম্মাহ)।	বুদ্ধি (আকল) ও সাবালকত্ব (বুলুগ)।

শুরুর সময়	মায়ের পেটে ভ্রূণ থাকা অবস্থা থেকে।	বুঝমান (তামিয়িজ) হওয়া বা বালেগ হওয়ার পর থেকে।
পাগলের ক্ষেত্রে	পাগলের 'ওজুব' বা আর্থিক দায় থাকে (সম্পদ নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হয়)।	পাগলের 'আদা' নেই (তার নামাজ বা বেচাকেনা সহীহ হয় না)।
কাজ	কেবল অধিকার ও দায়িত্ব সাব্যস্ত করে।	কাজ ও কথার বৈধতা দান করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আহলিয়াত' হলো মানুষের আইনি সত্তা। আহলিয়াতুল ওজুবের কারণে মানুষ মানুষ হিসেবে গণ্য হয় এবং সম্পদের মালিক হতে পারে। আর আহলিয়াতুল আদার কারণে সে শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে সক্ষম বা 'মুকাল্লাফ' হিসেবে গণ্য হয়। ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর এই বিভাজন শরিয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

প্রশ্ন-৩৫: 'আওয়ারিজ' বা প্রতিবন্ধকতাসমূহের সংজ্ঞা দাও। এগুলো কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف العوارض - وكم قسما لها؟ بين بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

পূর্ববর্তী প্রশ্নে আমরা মানুষের যোগ্যতা বা 'আহলিয়াত' সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু কখনো কখনো মানুষের এই যোগ্যতার ওপর এমন কিছু অবস্থা বা বাধা এসে পড়ে, যার কারণে তার শরিয়তের হুকুম পালনের ক্ষমতা লোপ পায় বা কমে যায়। উসূলুল ফিকহ-এর পরিভাষায় এগুলোকে 'আওয়ারিজ' (الْعَوَارِضُ) বা প্রতিবন্ধক বলা হয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) আহলিয়াতের আলোচনার পরপরই এই প্রতিবন্ধকতাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. 'আওয়ারিজ'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعَوَارِضِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'আওয়ারিজ' শব্দটি 'আরিজ' (عَارِضٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো—যা হঠাৎ উপস্থিত হয়, বাধা, প্রতিবন্ধক বা দুর্ঘটনা। এটি মানুষের স্থায়ী কোনো গুণ নয়, বরং সাময়িক অবস্থা।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هِيَ أُمُورٌ تَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَتُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّتِهِ أَوْ فِي أَحْكَامِهِ، وَلَا تُزِيلُ إِنْسَانِيَّتَهُ".

(আওয়ারিজ হলো এমন কিছু বিষয় বা অবস্থা, যা মানুষের ওপর পতিত হয়ে তার আহলিয়াত (যোগ্যতা) বা হুকুমে প্রভাব ফেলে—কখনো দায়িত্ব মাফ করে দেয়, কখনো পিছিয়ে দেয়—কিন্তু তার মানবিক সত্তা বা জিম্মাহকে বাতিল করে না।)

২. আওয়ারিজের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْعَوَارِضِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) মানুষের এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে উৎসের ভিত্তিতে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) আওয়ারিজ সামাবিয়্যাহ (عَوَارِضُ سَمَاوِيَّةٌ) - আসমানি বা প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক:

এগুলো এমন প্রতিবন্ধক, যা বান্দার নিজের ইখতিয়ার বা ইচ্ছায় হয় না, বরং আল্লাহ বা প্রকৃতির পক্ষ থেকে আসে। বান্দার এতে কোনো হাত নেই।

ইমাম বাজদাবি (রহ.) এ ধরণের ১০টি প্রতিবন্ধকের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:
১. সততা (ছোটকাল): শিশু অবস্থায় জ্ঞান থাকে না, তাই হুকুম বর্তায় না।
২. পাগলামি (জুনুন): এটি জ্ঞানবুদ্ধি নষ্ট করে দেয়, ফলে আহলিয়াতুল আদা থাকে না।
৩. বিস্মৃতি (নিসিয়ান): ভুলে যাওয়া। ভুলে গেলে গুনাহ মাফ হয়, তবে কাজ মাফ হয় না (পরে কাযা করতে হয়)।
৪. ঘুম (নাউম): ঘুমের মধ্যে কোনো হুকুম পালন সম্ভব নয়।
৫. অজ্ঞান হওয়া (ইগমা): এটি ঘুমের মতোই, তবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।
৬. দাসত্ব (রিক্ক): দাসের মালিকানা স্বত্ব থাকে না। (বর্তমানে এটি বিলুপ্ত)।
৭. অসুস্থতা (মারজ): এর কারণে ইবাদতে ছাড় পাওয়া যায় (যেমন—বসে নামাজ পড়া)।
৮. ঋতুস্রাব (হায়েজ): মহিলাদের নামাজের হুকুম মাফ হয়ে যায়।
৯. প্রসব পরবর্তী স্রাব (নিফাস): এটিও হায়েজের মতোই।
১০. মৃত্যু (মাওত): মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার সব আহলিয়াত শেষ হয়ে যায়।

- (খ) আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ (عَوَارِضُ مُكْتَسَبَةٌ) - অর্জিত বা মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধক:

এগুলো এমন প্রতিবন্ধক, যা বান্দার নিজের কাজ বা অন্য মানুষের কাজের ফলে সৃষ্টি হয়। এতে বান্দার ইচ্ছা বা অবহেলার দখল থাকে।

ইমাম বাজদাবি (রহ.) এ ধরণের ৭টি প্রতিবন্ধকের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

১. অজ্ঞতা (জাহল): শরিয়তের বিধান না জানা। দারুল ইসলামে এটি ওজর নয়, তবে দারুল হরবে হতে পারে।
২. মাতলামি (সুকর): মদ পান করে জ্ঞান হারানো। হারাম পন্থায় হলে শাস্তিযোগ্য, কিন্তু হালাল পন্থায় (ওষুধ খেয়ে) হলে ওজর।
৩. ঠাট্টা (হাজল): ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দের ভুল অর্থ নেওয়া। এটি বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে।
৪. নির্বুদ্ধিতা (সাফাহ): সম্পদের অপব্যয় করা। এর কারণে সম্পদ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা (হাজর) আসতে পারে।
৫. ভুল (খাতা): অনিচ্ছাকৃত ভুল করা। যেমন—পাখি মারতে গিয়ে মানুষ মারা। এতে কিসাস মাফ হয়, কিন্তু দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হয়।
৬. জবরদস্তি (ইকরাহ): কাউকে হত্যার হুমকি দিয়ে কোনো কাজ করানো। এটি সন্তুষ্টি (রেজা) নষ্ট করে।
৭. সফর: সফরের কারণে নামাজ কসর হয় এবং রোজা না রাখার অনুমতি থাকে।

৩. আওয়ারিজের ফলাফল বা হুকুম:

এই প্রতিবন্ধকতাগুলো মানুষের 'আহলিয়াত' বা যোগ্যতাকে তিনভাবে প্রভাবিত করে:

- **সম্পূর্ণ বিলুপ্তি:** যেমন—পাগলামি বা মৃত্যু আহলিয়াতকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়।
- **হ্রাসকরণ:** যেমন—নির্বুদ্ধিতা (সাফাহ) বা দাসত্ব আহলিয়াতকে কমিয়ে দেয় (কিছু কাজ বৈধ, কিছু অবৈধ)।
- **পরিবর্তন:** যেমন—ঘুম বা বিস্মৃতি দায়িত্বকে বাতিল করে না, কিন্তু আদায়ের সময়কে পিছিয়ে দেয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আওয়ারিজ' বা প্রতিবন্ধকতার আলোচনা শরিয়তের মহানুভবতার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। যখনই আসমানি বা মানবিক কারণে মানুষের যোগ্যতা কমে যায়, তখনই শরিয়ত তার হুকুম শিথিল করে দেয়। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইসলামি আইন বা ফিকহ শাস্ত্রের বিশাল 'রুখসত' বা সহজীকরণের অধ্যায় গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-৩৬: 'ইকরাহ' (জবরদস্তি)-এর সংজ্ঞা দাও। ইকরাহ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ এর হুকুম বা বিধান বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف الإكراه - وكم قسما له؟ بين حكمه بالتفصيل والتمثيل

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের শরিয়তের বিধান পালনের যোগ্যতা বা 'আহলিয়াত'-এর পথে অন্যতম একটি মানবিক প্রতিবন্ধক (আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ) হলো 'ইকরাহ' বা জবরদস্তি। ইসলামি শরিয়ত মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে আমলের বিচার করে। কিন্তু যখন কাউকে জোর করে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তখন তার বিধান কী হবে—তা উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) ইকরাহের প্রকারভেদ ও প্রভাব নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।

১. 'ইকরাহ'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْإِكْرَاهِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'ইকরাহ' (الْإِكْرَاهُ) শব্দের অর্থ হলো—বাধ্য করা, জবরদস্তি করা বা কোনো কাজ করতে কাউকে অপছন্দনীয় অবস্থায় ফেলা।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إِيقَاعِهِ."

(ইকরাহ হলো কাউকে এমন কোনো কাজ করতে ভয়ভীতির মাধ্যমে বাধ্য করা, যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় করতে চাইত না। এবং বাধ্যকারী ব্যক্তি সেই ভয় বা হুমকি বাস্তবায়নে সক্ষম।)

২. ইকরাহের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْإِكْرَاهِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) ও হানাফি উসুলবিদগণ ইকরাহকে হুমকির তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) ইকরাহে মুলজি বা পূর্ণাঙ্গ জবরদস্তি (إِكْرَاهٌ مُلْجِئٌ / كَامِلٌ):

এটি এমন জবরদস্তি, যেখানে মানুষের জান বা অঙ্গহানির ভয় দেখানো হয়।

  - **শর্ত:** হত্যার হুমকি, অঙ্গ কেটে ফেলার হুমকি বা এমন প্রহারের হুমকি যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
  - **প্রভাব:** এটি মানুষের 'রেজা' (সন্তুষ্টি/Consent) সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয় এবং 'ইখতিয়ার' (ইচ্ছা/Choice)-কে ত্রুটিযুক্ত (ফাসিদ) করে দেয়। কারণ মানুষ বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে কাজটি বেছে নেয়।

- (খ) ইকরাহে গাইরে মুলজি বা অপূর্ণাঙ্গ জবরদস্তি (إِكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ / نَاقِصٌ):

এটি এমন জবরদস্তি, যেখানে জান বা মালের বড় ক্ষতির ভয় থাকে না, বরং সাময়িক কষ্ট বা শোকের ভয় থাকে।

  - **শর্ত:** সাধারণ মারধর, কিছুদিন বন্দি রাখা বা হাত-পা বেঁধে রাখার হুমকি।
  - **প্রভাব:** এটি মানুষের 'রেজা' (সন্তুষ্টি) নষ্ট করে দেয় ঠিকই, কিন্তু 'ইখতিয়ার' (ইচ্ছা) নষ্ট করে না।

৩. ইকরাহের হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الْإِكْرَاهِ):

ইকরাহের ফলে কৃত কাজের বিধান কাজের ধরণের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হয়:

- **(১) হারাম কাজ বা গুনাহর ক্ষেত্রে:**
  - **কুফরি বাক্য বলা:** যদি হত্যার হুমকি (ইকরাহে মুলজি) দিয়ে কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করা হয়, আর সে অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে মুখে তা বলে, তবে সে কাফের হবে না। বরং জান বাঁচানোর জন্য এটি 'রুখসত' বা বৈধ।
  - **মদ পান বা শুকর খাওয়া:** জীবন বাঁচানোর জন্য হত্যার হুমকিতে এগুলো খাওয়া হালাল বা ওয়াজিব হয়ে যায়।
  - **অন্যকে হত্যা করা:** যদি কাউকে বলা হয় "অমুককে হত্যা কর, নইলে তোমাকে হত্যা করব"—তবে হানাফি ও অধিকাংশ ইমামের মতে, এমতাবস্থায় **অন্যকে হত্যা করা জায়েজ নয়**। কারণ নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনের মূল্য কম নয়। যদি সে হত্যা করে, তবে সে গুনাহগার হবে (এবং কিসাস হতে পারে)।
- **(২) মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে:**
  - **ক্রয়-বিক্রয় (বাই):** জবরদস্তি করে জমি বা মাল বিক্রি করালে বা কিনলে হানাফি মতে সেই বেচাকেনা **'ফাসিদ'** (ত্রুটিযুক্ত) হবে। ভিকটিম পরে চাইলে তা বাতিল করতে পারবে। কারণ এখানে 'রেজা' বা সন্তুষ্টি নেই।
  - **বিবাহ:** জবরদস্তি করে বিয়ে পড়ালে বিবাহ হয়ে যাবে (যদিও এটি অপছন্দনীয়)।
- **(৩) তালাকের ক্ষেত্রে (তালাকুল মুকরাহ):**
  - **হানাফি মত:** যদি কাউকে হত্যার হুমকি দিয়েও জোর করে স্ত্রীর তালাক দেওয়ানো হয়, তবুও হানাফি মাজহাবে **তালাক পতিত হয়ে যাবে**।

- **যুক্তি:** তালাক একটি মৌখিক কাজ যা শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে কার্যকর হয়। এখানে লোকটি জান বাঁচানোর জন্য 'তালাক' শব্দটিকে বেছে নিয়েছে (ইখতিয়ার করেছে), তাই তালাক হয়ে যাবে। (তবে বাধ্যকারী গুনাহগার হবে)।

- **অন্যান্য মাজহাব:** শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মতে জবরদস্তির তালাক হয় না। হাদিসে আছে, "জবরদস্তির (ইগলাক) তালাক নেই"।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইকরাহ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। শরিয়ত জীবন রক্ষার জন্য হারাম কাজ করার অনুমতি দিলেও (যেমন- কুফরি বলা), অন্যের ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না (যেমন- হত্যা করা)। আর তালাকের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে হানাফি মাজহাবের কঠোর অবস্থান মূলত তালাকের শব্দ নিয়ে খেলা না করার সতর্কবার্তা।

প্রশ্ন-৩৭: 'সাফাহ' (নির্বুদ্ধিতা)-এর সংজ্ঞা দাও। সাফাহ-এর কারণে কি মানুষের ওপর 'হাজর' (সম্পদ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করা যায়? এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف السفه - وهل يجوز الحجر علي السفيه؟ بين اختلاف الائمة في ذلك

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে মানুষের যোগ্যতা বা আহলিয়াতের পথে অন্যতম একটি মানবিক প্রতিবন্ধক (আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ) হলো 'সাফাহ' বা নির্বুদ্ধিতা। সম্পদ উপার্জনের চেয়ে সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করা কঠিন। যখন কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তার সম্পদ অনর্থক বা হারাম পথে উড়ায়, তখন শরিয়ত তার ওপর নিষেধাজ্ঞা (হাজর) আরোপ করবে কি না—এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে একটি বিখ্যাত মতভেদ রয়েছে। এই আলোচনা ফিকহ ও মানবাধিকারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

১. 'সাফাহ'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ السَّفَهِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'সাফাহ' (السَّفَهُ) শব্দের অর্থ হলো—হালকা হওয়া, লঘু হওয়া বা নড়বড়ে হওয়া (Khiffah)। আরবিতে বলা হয় 'ছাওবুন সাফীহুন' (হালকা কাপড়)। বুদ্ধির হালকাপনাকেই সাফাহ বলা হয়।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ خِفَّةٌ فِي الْعَقْلِ تَبْعَثُ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ مُوجَبِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْلِ كَامِلًا".

(সাফাহ হলো বুদ্ধির এমন এক হালকাপনা বা অপরিপক্কতা, যা মানুষকে শরিয়ত ও যুক্তির বিপরীতে সম্পদ ব্যয় করতে প্ররোচিত করে, যদিও তার মূল আকল বা বুদ্ধি পুরোপুরি বিদ্যমান থাকে।)

সহজ কথায়, পাগল নয় কিন্তু টাকার কদর বোঝে না বা গুনাহের কাজে টাকা উড়ায়।

২. সাফীহ বা নির্বোধের ওপর 'হাজর' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ (الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ):

প্রশ্ন হলো: একজন বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ যদি তার সম্পদ এলোমেলোভাবে খরচ করে, তবে কি কাজীর জন্য জায়েজ আছে তার হাত আটকে দেওয়া বা তার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া?

এ বিষয়ে **দুটি প্রধান মত** রয়েছে:

- প্রথম মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর অভিমত:

তাঁদের মতে: "সাফীহ ব্যক্তির ওপর হাজর বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ওয়াজিব বা বৈধ।"

যুক্তি:

১. সম্পদ রক্ষা: সম্পদের অপচয় রোধ করা শরিয়তের উদ্দেশ্য। সাফীহ ব্যক্তি যেহেতু নিজের ভালো বোঝে না, তাই তাকে রক্ষা করার জন্য তার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া জরুরি।

২. কিয়াস: নাবালেগ শিশুর ওপর যেমন সম্পদ ব্যবহারে বাধা দেওয়া হয় (যাতে সে নষ্ট না করে), তেমনি সাফীহ ব্যক্তির ওপরও বাধা দেওয়া উচিত। কারণ উভয়ের মধ্যে 'বুদ্ধির অপরিপক্কতা' সমান।

- দ্বিতীয় মত: ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত:

তাঁর মতে: "স্বাধীন, সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর হাজর বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জায়েজ নেই, যদিও সে সম্পদ সাগরে ভাসিয়ে দেয়।"

শক্তিশালী যুক্তি:

১. মানুষের মর্যাদা (তাকরীমে ইনসানিয়াত): আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। একজন সুস্থ বালেগ মানুষকে সম্পদ ব্যবহার করতে না দেওয়া বা তার হাত বেধে রাখা তাকে 'পশু' বা 'শিশু'র স্তরে নামিয়ে আনার শামিল। সম্পদ নষ্ট হওয়া ছোট ক্ষতি, কিন্তু একজন মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া এর চেয়ে অনেক বড় ক্ষতি। ছোট ক্ষতি রোধ করতে গিয়ে বড় ক্ষতি (অসম্মান) করা যাবে না।

২. পরীক্ষা: আল্লাহ মানুষকে সম্পদ দিয়েছেন পরীক্ষার জন্য। সে ভালো পথে ব্যয় করবে না মন্দ পথে, তার হিসাব আল্লাহ নেবেন। দুনিয়াতে তার স্বাধীনতা হরণ করা ঠিক নয়।

"إِهْدَارُ الْمَالِ أَهْوَنُ مِنْ إِهْدَارِ الْآدَمِيَّةِ." (সম্পদ ধ্বংস হওয়া মানবতা ধ্বংস হওয়ার চেয়ে তুচ্ছ।)

৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে সমাধানের পথ:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাজর আরোপ করেন না ঠিকই, তবে তিনি সম্পদের সুরক্ষার জন্য অন্য একটি সময়সীমা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনো যুবক বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই তাকে সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া হবে না, বরং ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। যদি ২৫ বছর বয়সেও সে ভালো-মন্দ না বোঝে, তখন তাকে সম্পদ দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ ২৫ বছর হলো দাদা হওয়ার বয়স, এ সময় সাধারণত মানুষের বুদ্ধি পাকে।

৪. সাফীহ ব্যক্তির লেনদেনের হুকুম (حُكْمُ تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ):

- **সাহিবাইন ও শাফেয়ী মতে:** হাজর চলাকালীন তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। সে দান করলে তা কার্যকর হবে না।
- **ইমাম আবু হানিফা মতে:** তার সমস্ত লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং দান **সহীহ ও কার্যকর** হবে। তবে সম্পদ ওড়ানোর জন্য সে পরকালে দায়ী থাকবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'সাফাহ' মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা। ইমাম শাফেয়ী ও সাহিবাইন সম্পদের নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়েছেন, তাই তারা নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষকে ভুল করার স্বাধীনতা দেওয়াই হলো তার মানুষ হওয়ার প্রমাণ; তাকে জোর করে ভালো বানানো বা আটকানো তার মনুষ্যত্বের অপমান।

প্রশ্ন-৩৮: 'হাজল' (ঠাট্টা)-এর সংজ্ঞা দাও। হাজল বা ঠাট্টা কি 'ইখতিয়ার' (ইচ্ছা) ও 'রেজা' (সন্তুষ্টি)-এর পরিপন্থী? হাজল অবস্থায় কৃত লেনদেন বা চুক্তির হুকুম কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف الهزل - وهل ينافي الاختيار والرضا؟ وما حكم التصرفات مع الهزل؟ بين بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের যোগ্যতা বা আহলিয়াতের পথে আরেকটি মানবিক প্রতিবন্ধক (আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ) হলো 'হাজল' বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। ইসলামি শরিয়তে প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য 'নিয়ত' বা উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মানুষ অনেক সময় হাসি-তামাশা বা কৌতুক করে এমন সব কথা বলে ফেলে (যেমন—তালাক বা বিয়ে), যার আইনি ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর। উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রে এই ধরনের 'ঠাট্টা'র আইনি মর্যাদা কী, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের সুস্পষ্ট বিধান তুলে ধরেছেন।

১. 'হাজল'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْهَزْلِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'হাজল' (الْهَزْلُ) শব্দের অর্থ হলো—কৃশতা, দুর্বলতা, কৌতুক বা হাসি-তামাশা করা। এটি 'জিদ' (সিরিয়াস বা গুরুত্ব)—এর বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ، وَلَا مَا يَصْلُحُ لَهُ."

(হাজল হলো এমনভাবে শব্দ উচ্চারণ করা, যার মাধ্যমে বক্তা সেই শব্দের হাকীকী (আসল) অর্থও উদ্দেশ্য নেয় না, আবার মাজাযী (রূপক) অর্থও উদ্দেশ্য নেয় না। বরং সে কেবল শব্দ উচ্চারণ করতে চায়, কিন্তু এর বিধান বা ফলাফল কার্যকর হোক—তা চায় না।)

যেমন—অভিনয় করে বা বন্ধুদের হাসানোর জন্য বলা, "তোমাকে তালাক দিলাম"।

২. হাজল কি ইখতিয়ার ও রেজার পরিপন্থী? (هَلْ يُنَافِي الِاخْتِيَارَ وَالرِّضَا؟):

হাজল বা ঠাট্টার মধ্যে মানুষের 'ইচ্ছা' ও 'সন্তুষ্টি' কতটুকু থাকে, তা নিয়ে ইমামগণের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

- **ইখতিয়ার (ইচ্ছা):** হাজল **'ইখতিয়ার'-এর পরিপন্থী নয়**। অর্থাৎ, ঠাট্টাকারীর শব্দ উচ্চারণের পূর্ণ ইখতিয়ার বা ইচ্ছা থাকে। সে জেনেশুনেই শব্দটি উচ্চারণ করেছে, কেউ তাকে বাধ্য করেনি।

- **রেজা (সন্তুষ্টি):** হাজল **'রেজা' বা সন্তুষ্টির পরিপন্থী**। অর্থাৎ, ঠাট্টাকারী শব্দটি উচ্চারণ করতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর আইনি ফলাফল (হুকুম) সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে তার কোনো সন্তুষ্টি বা সম্মতি নেই।

৩. হাজল অবস্থায় কৃত লেনদেন বা চুক্তির হুকুম (حُكْمُ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ الْهَزْلِ):

শরিয়তে ঠাট্টা করে বলা কথাগুলোর বিধান বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে এগুলো নিম্নরূপ:

- (ক) বাতিলযোগ্য চুক্তি (যেমন—ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা):

যেসব চুক্তিতে 'রেজা' বা সন্তুষ্টি থাকা শর্ত (যেমন—ব্যবসা), সেগুলো ঠাট্টা করে করলে 'ফাসিদ' (বাতিলযোগ্য) হয়ে যাবে।

  - **বিধান:** যদি কেউ ঠাট্টা করে বলে "আমি আমার বাড়িটি ১ টাকায় বিক্রি করলাম" এবং অন্যজন বলে "কিনলাম", তবে এই বিক্রি কার্যকর হবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "ব্যবসা হতে হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির (আন তারাদিন) ভিত্তিতে"। হাজলে সেই সন্তুষ্টি থাকে না।

- (খ) বাতিল অযোগ্য চুক্তি (যেমন—বিবাহ, তালাক ও গোলাম আজাদ):

যেসব বিষয় শরিয়তে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং যা বাতিল করার সুযোগ নেই, সেগুলো ঠাট্টা করে বললেও সম্পূর্ণ কার্যকর (সহীহ) হয়ে যাবে। এখানে ঠাট্টা কোনো ওজর হিসেবে গৃহীত হবে না।

  - **হাদিস:** রাসূল (সা.) বলেছেন:

"ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ."

(তিনটি বিষয় এমন, যা সিরিয়াসভাবে করলে তো সিরিয়াস বটেই, এমনকি ঠাট্টা করে করলেও তা সিরিয়াস (কার্যকর) হয়ে যায়: বিবাহ, তালাক এবং তালাক প্রত্যাহার।)

  - **বিধান:** কেউ যদি অভিনয় করে বা মশকরা করে স্ত্রীকে বলে "তোমাকে তালাক দিলাম", তবে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে। তার অন্তরে তালাকের নিয়ত না থাকলেও কাজ হবে। কারণ সে স্বেচ্ছায় (ইখতিয়ারে) শব্দটি মুখে এনেছে।

- (গ) অপরাধ ও শাস্তি (কিসাস ও হদ):

হাজল বা ঠাট্টা অনেক সময় শাস্তির সন্দেহ (শুবহা) হিসেবে কাজ করে, ফলে বড় শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে।

  - **উদাহরণ:** যদি কেউ কুফরি বাক্য ঠাট্টা করে বলে, তবে তাকে মুরতাদ বা কাফের বলা হবে না (যদি সে বিশ্বাসে অটল থাকে)। তবে এটি জঘন্য গুনাহ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি শরিয়ত মানুষকে তার জিহ্বা বা কথার ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক করেছে। 'হাজল' বা ঠাট্টা করে সব কথা বলা যায় না। বিশেষ করে বিবাহ ও তালাকের মতো পারিবারিক বন্ধন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হানাফি ফিকহের এই বিধান সমাজকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে শেখায়।

প্রশ্ন-৩৯: 'খাতা' (ভুল)-এর সংজ্ঞা দাও। খাতা কত প্রকার ও কী কী? এর হুকুম বা বিধান বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف الخطأ - وكم قسما له؟ بين حكمه بالتفصيل

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের আহলিয়াত বা যোগ্যতার পথে আরেকটি মানবিক প্রতিবন্ধক (আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ) হলো 'খাতা' বা ভুল করা। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে সব ভুলের বিধান এক নয়। বিশেষ করে বিচারিক ক্ষেত্রে (যেমন—হত্যা বা সম্পদ নষ্ট করা) ভুলের কারণে শাস্তি হবে কি না বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না—তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) 'খাতা'-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।

১. 'খাতা'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْخَطَأِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'খাতা' (الْخَطَأُ) শব্দের অর্থ হলো—সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া বা ভুল করা। এটি 'সাওয়াব' (সঠিক)-এর বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ فِعْلًا فَيَقَعَ مِنْهُ غَيْرُ مَا قَصَدَهُ."

(খাতা হলো এমন কাজ, যেখানে মানুষ কোনো একটি কাজ বা উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, কিন্তু বাস্তবে তার থেকে এমন কিছু ঘটে যায় যা সে উদ্দেশ্য করেনি।)

অর্থাৎ, এখানে 'ইচ্ছা' থাকে, কিন্তু ফলাফলটি ইচ্ছার বাইরে চলে যায়। (এটি 'ভুলে যাওয়া' বা নিসিয়ান থেকে ভিন্ন; কারণ নিসিয়ানে কাজের কথাই মনে থাকে না)।

২. খাতার প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْخَطَأِ):

ইমাম বাজদাবি (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণ খাতাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

- (ক) খাতা ফিল ফি'ল (خَطَأٌ فِي الْفِعْلِ) - কাজে বা কর্মে ভুল:

যখন কেউ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে চায়, কিন্তু কাজটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য কোথাও আঘাত করে।

  - **উদাহরণ:** শিকারি একটি পাখিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল, কিন্তু তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশে থাকা একজন মানুষের গায়ে লাগল এবং সে মারা গেল।
  - **বিশ্লেষণ:** এখানে তার কাজ বা 'তীর ছোড়া' সঠিক ছিল, কিন্তু ফলাফল ভুল হয়েছে।

- (খ) খাতা ফিল কাসদ (خَطَأٌ فِي الْقَصْدِ) - উদ্দেশ্যে বা বিচারে ভুল:

যখন কেউ কোনো কিছুকে সঠিক মনে করে কাজ করে, কিন্তু পরে দেখা যায় তার ধারণা ভুল ছিল।

  - **উদাহরণ:** শিকারি দূরে নড়াচড়া করতে দেখে ভাবল সেটা 'হরিণ', তাই গুলি করল। কাছে গিয়ে দেখল সেটা 'মানুষ'।
  - **বিশ্লেষণ:** এখানে তার নিশানা ঠিক ছিল (সে যা দেখেছে তাতেই মেরেছে), কিন্তু তার 'কাসদ' বা ধারণা (যে ওটা হরিণ) ভুল ছিল।

৩. খাতার হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الْخَطَأِ):

খাতার বিধানকে দুই দিক থেকে বিবেচনা করা হয়: ১. পরকালীন (আখেরাত) এবং ২. ইহকালীন (দুনিয়া)।

- (ক) আখেরাতের বিধান (গুনাহ মাফ হওয়া):

রাসূল (সা.) বলেছেন:

"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ."

(আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং জবরদস্তিমূলক কাজের গুনাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।)

- তাই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো কবিরা গুনাহ হবে না। তবে সতর্কতার অভাব থাকলে লঘু গুনাহ হতে পারে।

- (খ) দুনিয়ার বিধান (শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ):

দুনিয়াবি হুকুমের ক্ষেত্রে ভুলকে 'ইচ্ছাকৃত' কাজের মতোই গণ্য করা হয়, তবে শাস্তির ধরণ ভিন্ন হয়।

- **১. কিসাস (বদলা):** ভুলে মানুষ হত্যা করলে **'কিসাস'** (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হয় না। কারণ কিসাসের জন্য 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' শর্ত।

- **২. দিয়াত (রক্তপণ):** ভুলের কারণে কিসাস মাফ হলেও **'দিয়াত'** বা পূর্ণ রক্তপণ দেওয়া ওয়াজিব হয়। কারণ মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি, ভুল হলেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

- **৩. কাফফারা:** হত্যার ভুলের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির জন্য কাফফারা (গোলাম আজাদ করা বা ৬০টি রোজা রাখা) ওয়াজিব হয়।

- **৪. সম্পদ নষ্ট:** যদি কেউ ভুলে অন্যের গ্লাস ভেঙে ফেলে, তবুও তাকে তার **জরিমানা** দিতে হবে। এখানে ভুল অজুহাত হিসেবে গৃহীত হবে না। কারণ "মানুষের হকের ক্ষেত্রে ভুল ও ইচ্ছা সমান"।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'খাতা' বা ভুল মানুষের অক্ষমতার প্রমাণ। শরিয়ত ভুলের কারণে আল্লাহর হক (যেমন—গুনাহ বা কিসাস) মাফ করে দিয়েছে বা শিথিল করেছে। কিন্তু বান্দার হক (যেমন—আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত) মাফ করেনি। কারণ ভুলকারীর ভুলের মাশুল নির্দোষ ভিকটিম দেবে কেন? এটিই ইসলামি আইনের ইনসাফ।

প্রশ্ন-৪০: 'জাহল' (অজ্ঞতা)-এর সংজ্ঞা দাও। জাহল কি শরিয়তে ওজর (অজুহাত) হিসেবে গণ্য হয়? দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের প্রেক্ষিতে এর বিধান বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف الجهل - وهل يعتبر عذرا في الشرع؟ بين حكمه باعتبار دار الاسلام ودار الحرب

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের আহলিয়াত বা যোগ্যতার পথে সর্বশেষ মানবিক প্রতিবন্ধক (আওয়ারিজ মুকতাসাবাহ) হলো 'জাহল' বা অজ্ঞতা। শরিয়তের বিধান পালন করার জন্য ইলম বা জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কিন্তু কেউ যদি বিধান না জানে, তবে কি তার ওপর বিধান আরোপিত হবে? নাকি অজ্ঞতার কারণে সে মাফ পেয়ে যাবে? হানাফি উসুলবিদগণ, বিশেষ করে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) এ বিষয়ে ভৌগোলিক অবস্থান (দারুল ইসলাম ও দারুল হরব)-এর ভিত্তিতে অত্যন্ত যৌক্তিক ফয়সালা দিয়েছেন।

১. 'জাহল'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْجَهْلِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'জাহল' (الْجَهْلُ) শব্দের অর্থ হলো—না জানা, মূর্খতা বা জ্ঞানের অভাব। এটি 'ইলম' (জ্ঞান)-এর বিপরীত।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هُوَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، أَوْ خُلُوُّ النَّفْسِ عَنِ الْعِلْمِ."

(জাহল হলো কোনো বিষয়কে তার বাস্তব অবস্থার বিপরীতে বিশ্বাস করা [জাহলে মুরাক্কাব], অথবা মন-মস্তিষ্ক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ খালি থাকা [জাহলে বাসিত]।)

২. জাহল কি শরিয়তে ওজর হিসেবে গণ্য? (هَلِ الْجَهْلُ عُذْرٌ؟):

জাহল শরিয়তে ওজর বা গ্রহণযোগ্য অজুহাত হবে কি না, তা নির্ভর করে স্থান বা পরিবেশের ওপর। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এর বিধান দুই ভাগে বিভক্ত:

- (ক) দারুল ইসলামে (মুসলিম রাষ্ট্রে) বসবাসকারীর জন্য:

দারুল ইসলামে বসবাসকারী কোনো মুসলিমের জন্য শরিয়তের বিধান না জানা বা জাহল কোনো ওজর হিসেবে গণ্য হবে না।

- **বিধান:** যদি কোনো ব্যক্তি দারুল ইসলামে বসবাস করে বলে, "আমি জানতাম না যে মদ খাওয়া হারাম" অথবা "নামাজ পড়া ফরজ"—তবে তার এই দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে শাস্তি পেতে হবে এবং কাজা আদায় করতে হবে।
- **যুক্তি:** দারুল ইসলামে আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং ইসলামি পরিবেশ বিদ্যমান। সেখানে জ্ঞান অর্জন করা সহজ এবং 'শায়িউন' (প্রচারিত)। জ্ঞান অর্জনে অবহেলা করাটা তার নিজের দোষ (তাকসীর), তাই সে মাফ পাবে না।

- (খ) দারুল হরবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) বসবাসকারীর জন্য:

দারুল হরবে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি যদি নতুন মুসলমান হয় এবং শরিয়তের বিধান না জানে, তবে তার জন্য জাহল ওজর হিসেবে গণ্য হবে।

- **বিধান:** যদি দারুল হরবের কোনো নওমুসলিম দীর্ঘদিন নামাজ না পড়ে বা রোজা না রাখে এবং পরে দাবি করে "আমি জানতাম না এগুলো ফরজ"—তবে কাজীর দরবারে তার কথা মেনে নেওয়া হবে। তাকে বিগত দিনের নামাজের কাজা করতে হবে না এবং গুনাহগারও করা হবে না।
- **যুক্তি:** দারুল হরবে ইসলামের প্রচার-প্রসার নেই এবং সেখানে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কম। তাই তার অজ্ঞতা অবহেলাবশত নয়, বরং পরিস্থিতির কারণে। আর অপারগতা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য ওজর।

৩. জাহলের প্রকারভেদ (বিশ্বাসগত দিক থেকে):

জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে জাহল দুই প্রকার, যার প্রভাব ফিকহী মাসআলায় পড়ে:

- ১. জাহলে বাসিত (সাধারণ অজ্ঞতা):

যে জানে না এবং সে জানে যে সে জানে না। এটি দূর করা সহজ।

- ২. জাহলে মুরাক্কাব (যৌগিক বা জটিল অজ্ঞতা):

যে জানে না, কিন্তু সে মনে করে সে জানে (ভুল বিশ্বাস)। এটি বেশি মারাত্মক। যেমন—মূর্তিপূজকদের বিশ্বাস। এ ধরনের অজ্ঞতা কখনোই ওজর হতে পারে না, বরং এটি কুফরির কারণ।

৪. হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে জাহল:

- **হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক):** দারুল ইসলামে অজ্ঞতা ওজর নয়, তবে দারুল হরবে ওজর হতে পারে (যেমন নামাজ-রোজা)।

- **হক্কুল ইবাদ (বান্দার হক):** বান্দার হকের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা **কোথাও ওজর নয়**।
    - **উদাহরণ:** কেউ যদি অন্যের খাবার খেয়ে ফেলে এবং বলে "আমি জানতাম না এটি তোমার", তবুও তাকে জরিমানা দিতে হবে। কারণ অজ্ঞতা দিয়ে অন্যের মাল নষ্ট করার অধিকার পাওয়া যায় না।

৫. পার্থক্য সারসংক্ষেপ:

বিষয়	দারুল ইসলাম	দারুল হরব
জ্ঞান অর্জনের সুযোগ	আছে (অবারিত)।	নেই বা খুব কম।
ওজর হিসেবে গ্রহণ	জাহল ওজর নয়।	জাহল ওজর হতে পারে।
শাস্তি (হদ)	অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে শাস্তি মাফ হবে না।	অজ্ঞতার কারণে শাস্তি মাফ হতে পারে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম জ্ঞানার্জনের ধর্ম। রাসূল (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ"। তাই মুসলিম দেশে বাস করে অজ্ঞ থাকাটা একটি অপরাধ, কোনো অজুহাত নয়। ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর এই নীতি মুসলিম সমাজকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে এবং অবহেলাকে নিরুৎসাহিত করে।

প্রশ্ন-৪১: 'সুন্নাহ' বা 'খবর'-এর সংজ্ঞা দাও। খবর কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

عرف السنة أو الخبر - وكم قسما له؟ بين بالتفصيل والتمثيل

উত্তর:

ভূমিকা:

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে শরিয়তের দলিলগুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআনের পরেই 'সুন্নাহ' বা 'খবর' (الْخَبَرُ)-এর স্থান। আল্লাহর কিতাবের সংক্ষিপ্ত বিধানগুলোর ব্যাখ্যা এবং নতুন বিধান সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস বা সুন্নাহ অপরিহার্য। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাজদাবি (রহ.) খবরের সত্যতা ও বর্ণনাকারীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি

করে একে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে কোন হাদিস কতটা শক্তিশালী, তা জানার জন্য এই প্রকারভেদ বোঝা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক।

১. 'সুন্নাহ' বা 'খবর'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ السُّنَّةِ أَوِ الْخَبَرِ):

- **আভিধানিক অর্থ:**
  - **সুন্নাহ:** পথ, তরিকা বা রীতিনীতি।
  - **খবর:** সংবাদ বা বার্তা।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

উসুলবিদগণের মতে:

"هِيَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ."

(রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী (কওল), কর্ম (ফেল) এবং মৌন সম্মতি (তাকরীর)-কে সুন্নাহ বা হাদিস বলা হয়।)

উসুলশাস্ত্রে একে 'খবর' হিসেবেও অভিহিত করা হয়, কারণ এটি রাসূল (সা.) থেকে আমাদের কাছে সংবাদ হিসেবে পৌঁছেছে।

২. খবরের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْخَبَرِ):

বর্ণনাকারীর সংখ্যা এবং প্রমাণের শক্তির ওপর ভিত্তি করে হানাফি উসুলবিদগণ খবরকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন:

- **(ক) খবরে মুতাওয়াতির (خَبَرُ الْمُتَوَاتِرِ):**
  - **সংজ্ঞা:** যে হাদিস বা সংবাদ রাসূল (সা.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগে এত বিপুল সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সবার পক্ষে মিথ্যা কথায় একমত হওয়া বা ভুল করা অসম্ভব।
  - **উদাহরণ:** কুরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদিস **"যে আমার ওপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়"**।
  - **হুকুম:** এটি **'ইলমে ইয়াকিনি'** (সুনিশ্চিত জ্ঞান) দান করে। এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা 'ফরজ'। একে অস্বীকারকারী **'কাফের'** হয়ে যাবে। এটি কুরআনের আয়াতের মতোই শক্তিশালী দলিল।

- **(খ) খবরে মাশহুর (خَبَرُ الْمَشْهُورِ):**
  - **সংজ্ঞা:** যে হাদিস সাহাবী যুগে 'আহাদ' (একক) হিসেবে বর্ণিত ছিল, কিন্তু তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগে এটি ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে এবং মুতাওয়াতিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।
  - **উদাহরণ: "আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল"** (ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত) এবং **"রজমের হাদিস"**।
  - **হুকুম:** এটি **'ইলমে তুমানিনাত'** (প্রশান্তিযুক্ত জ্ঞান) দান করে। এর ওপর আমল করা **'ওয়াজিব'**। একে অস্বীকারকারী কাফের হবে না, তবে সে **'বিদআতি'** ও **'ফাসিক'** (পাপিষ্ঠ) হিসেবে গণ্য হবে।
- **(গ) খবরে ওয়াহিদ বা আহাদ (خَبَرُ الْوَاحِدِ):**
  - **সংজ্ঞা:** যে হাদিস রাসূল (সা.) থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মাশহুর বা মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছায়নি। হাদিসের কিতাবের অধিকাংশ হাদিসই এই প্রকারের।
  - **হুকুম:** এটি **'ইলমে জন্নী'** (প্রবল ধারণামূলক জ্ঞান) দান করে।
    - আকিদার ক্ষেত্রে এটি দলিল হয় না (তাই এর ভিত্তিতে কাউকে কাফের বলা যায় না)।
    - আমল বা ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে এর ওপর আমল করা **'ওয়াজিব'**। যদি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ (আদিল) ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন (জাবিত) হন, তবে তা গ্রহণ করা হয়।

৩. প্রকারভেদের ছক ও পার্থক্য:

প্রকার	বর্ণনাকারীর সংখ্যা	জ্ঞানের মান	অস্বীকারের বিধান	উদাহরণ
মুতাওয়াতির	প্রতিটি স্তরে অসংখ্য (মিথ্যা অসম্ভব)।	ইলমে ইয়াকিনি (সুনিশ্চিত)।	কাফের (কুফর)।	পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

মাশহুর	সাহাবী যুগে কম, পরে ব্যাপক।	ইলমে তুমানিনাত (প্রশান্তি)।	বিদআতি/ফাসিক।	ইন্নামাল আ'মালু...।
খবরে ওয়াহিদ	সীমিত সংখ্যক।	ইলমে জন্নি (ধারণা)।	কাফের বা ফাসিক নয় (তবে আমল ত্যাগকারী গুনাহগার)।	সাধারণ ফিকহী হাদিস।

৪. হানাফি মাজহাবে খবরের অবস্থান:

ইমাম বাজদাবি (রহ.)-এর মতে, কুরআনের 'আম' (ব্যাপক) আয়াতের ওপর 'খবরে ওয়াহিদ' দিয়ে 'জিয়াদাত' (অতিরিক্ত বিধান আরোপ) করা যায় না। কারণ কুরআন অকাট্য (কাতয়ী), আর খবরে ওয়াহিদ ধারণামূলক (জন্নি)। তবে 'খবরে মাশহুর' দ্বারা কুরআনের ওপর বৃদ্ধি বা ব্যাখ্যা করা জায়েজ।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'সুন্নাহ' হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। মুজতাহিদগণ মাসআলা বের করার সময় প্রথমে মুতাওয়াতির, তারপর মাশহুর এবং শেষে খবরে ওয়াহিদকে প্রাধান্য দেন। হানাফি ফিকহের অনেক স্বকীয়তা (যেমন—ফরজ ও ওয়াজিবের পার্থক্য) মূলত এই হাদিসের শ্রেণিবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।